RUPASHI CHANDPUR

(A Bengali Literary Magazine)

Editor
Dewan Abdul Baset

Computer composed by
Lubna Baset Bristi

Special Supplement of 141th Birth Anniversary of The Great Poet Rabindranath Tagore

Published on July 2002
Special Issue Baishakh / Jaishtha- 1409 Bangla

Email : dewana@ngha.med.sa
marupalash@yahoo.com

Published by "Marupalash" Group of Publication
Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia.

রূপসী চাঁদপুর

(মধ্যপ্রাচ্য প্রবাসী চাঁদপুর জেলাবাসীদের মুখপত্র)

১৪১তম রবীন্দ্র জন্মজয়ন্তী
বিশেষ সংখ্যা ১৪০৯ বাঙলা
প্রকাশকাল-জুলাই-২০০২
বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ-১৪০৯বাঙলা

সম্পাদক
দেওয়ান আবদুল বাসেত

মরুপলাশ গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স, ঢাকা ,বাংলাদেশ হতে প্রকাশিত।
জোনাল অফিসঃ রিয়াদ, সউদী আরব

প্রবন্ধ

রবীন্দ্র প্রতিভা, চিরঅম্লান

ডক্টর মনজুরুল ইসলাম

রবীন্দ্র-গবেষক বা রবীন্দ্র-সাহিত্যের অত্যন্ত নিষ্ঠাবান ছাত্র বা পর্যবেক্ষক ছাড়া অন্য কারো দ্বারা রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে আলোচনা করায় অসম্পূর্ণতা বা অস্পষ্টতা থাকার সমূহ সম্ভাবনা রয়ে যায়। আমি তাই ভীত, সন্ত্রস্ত। একজন সাধারণ পাঠক বা তার সংগীতের একজন ভক্ত-শ্রোতা হিসাবে, এই মহৎ কবি সম্পর্কে লিখতে বসে যেন হাবুডুবু খাচ্ছি। তার যেই বিশাল সাহিত্যক্ষেত্র, তার কতটুকু পেরেছি বিচরণ করতে; তার যে বহুমুখী কর্মজীবন, তার কতটুকু পেরেছি অনুভব করতে; এই কবির জীবনদর্শনে যেই গভীরতা, বিশ্বমানবতার আদর্শের প্রতি যেই প্রচেষ্টা, তার কতটুকু পেরেছি উপলব্ধি করতে।

সাহিত্যের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হলেও, আমার পেশা থেকে কবি সম্রাটকে বিশদভাবে অধ্যয়ন করা কঠিন হয়- এটা সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। তবু বন্ধুদের অনুরোধে কবির জন্মবার্ষিকীতে, পঁচিশে বৈশাখ উপলক্ষে, হাতের কাছে প্রবাসে কোন সূত্রগ্রন্থের অভাবে অবস্থান সত্ত্বেও সামান্য চেষ্টা করেছি, অনেকটা তাৎক্ষণিকভাবেই।

আসলে, আমি কবিগুরুকে দেখি একজন মহাকবিরূপে; একজন সক্রিয়, বাস্তববাদী, আধুনিক চিন্তাবিদ ও দার্শনিক হিসাবে, একজন অতি সার্থক গীত রচয়িতা হিসাবে এবং একজন সম্পূর্ণ সচেতন বাঙালি ও সাংস্কৃতিক মানুষ হিসাবে। তার মাধ্যমে বাঙালির ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রতিনিধিত্বশীল পরিচিতি ছড়ায় গোটা বিশ্বে। আলাদা আলাদাভাবে তার অন্য পরিচয় যেগুলোতে একইভাবে উজ্জ্বলতার সাথে বিদ্যমান, সাহিত্যের সেইসব দিকে- যথা: তাকে নাট্যকার, উপন্যাসিক, ছোটগল্পকাররূপে বা অপরদিকে একজন ভাবুক চিত্রশিল্পী হিসাবে না হয় আপাতত: এই প্রবন্ধের সীমিত পরিসরে আলোচনা না-ই করলাম।

আমার একটি উপলব্ধি বহুবার জাগ্রত হয়েছে - তিনি ছিলেন একজন সম্পূর্ণ মানুষ, একটি প্রতিভা যা হঠাৎ করে খ্যাতিলাভ করেনি, এমন এক সৃজনীশক্তির অধিকারী যাকে অনুকরণ করার চেষ্টাও হবে বৃথা। ধীরে ধীরে ক্রমবিবর্তিত এক অভাবনীয় সৃষ্টিকর্মের উদ্ভাবক তিনি। আরো মনে হয়েছে, তার সম্বন্ধে জানতে হলে, তার ভিতরে আসল মানুষটা এবং মানবতাবাদী সৃজনশীল প্রতিভাটি সম্পর্কে, এমনকি তার প্রধান কীর্তি, সেই কাব্যসৃষ্টির সত্যিকারের খোঁজ পেতে চাইলে, তার কতগুলো বই বারম্বার পাঠ করার দাবী রাখে। তার বাস্তব কীর্তিসমূহ - যথা: বিশ্ব সংস্কৃতির মিলন কেন্দ্র - শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতন একাধিকবার পরিদর্শন করা প্রয়োজন।

আমার এই ধারণা হয়েছে ছোটখাটো কতগুলো ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে। ১৯৬১ সনে, কলেজে ছাত্রাবস্থায়, ঢাকায় তার জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে, একটু বিশদভাবে (ঐ লেভেলের একটি ছাত্রের তুলনায়) তার অনেকগুলো বই নতুনভাবে পাঠ করি। সেসময় তার সম্বন্ধে প্রচুর আলোচনা-সমালোচনা প্রকাশিত হয়, যার অনেকগুলো পড়ার সুযোগ হলেও সব বুঝতাম না, তার শেষের কবিতাততদিনে দুইবার পড়ে ফেলেছি। ভালো বুঝিনি তখনো। একথা বুঝেছি বড় হয়ে আরো কয়েকবার পড়ার পর। তার সোনার তরী মানসী চিত্রা বলাকা ইত্যাদি কাব্য শুধু পড়ে পড়ে এক গীতিকাব্য ও চিন্তাধারার সাথে পরিচিত হতে চেষ্টা করেছি। পরবর্তীতে বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি সাহিত্য পাঠকালে কীট্স, শেলী, ওয়ার্ডসওয়ার্থ প্রমুখ রোমান্টিক কবির সাথে তুলনার চেষ্টা করেছি- কিন্তু বেশীই মনে হয়েছে আমাদের কবি আরো অনেক বড়, আরো অভিজ্ঞ, আরো জ্ঞানী। তিনি বিস্তৃততর চিন্তাধারার অধিকারী। তার ক্যানভাস বিশ্বব্যাপী। তার সাহিত্যকর্মে অতি বেশী চমক লাগানো কাব্যের অবতারণা নেই, যেমন নেই অতি-উন্নত এবং অতি-সাধারণ, এই জাতীয় দুই প্রান্তিক এর স্পষ্ট পার্থক্য। সর্বদাই যেন শান্ত, এক প্রশান্তির গতিতে চলে। তা স্থির, পরিশীলিত মনকে ধরে রাখবার মতো এবং স্বাভাবিক অথচ অকল্পনীয় চিন্তাপ্রসূত।

সবসময় একটি অদ্ভূত মানবিকগুণে আন্তর্জাতিক সম্প্রীতি জাগানোতে, বিশ্বজনীন আবেদন সৃষ্টিতে অথবা বাঙালি সংস্কৃতির আবেগে অথচ গোঁড়ামিমুক্ত আধুনিকতা ও সরলতার ধাচে ঘেরা এবং অবিচ্ছেদ্য সূতায় গাঁথা। তার কাব্যে ও গানে যেই গতিশীলতা ও গীতিময়তা, তা পাঠক ও শ্রোতাকে এক সম্মোহনী শক্তিতে আঁকড়ে রাখে। আরো পরে, পরিণত বয়সে উপলব্ধি করতে পেরেছি, কেন ইংরেজিতে তার নিজের অনুবাদ করা গীতাঞ্জলি- যেটি নিজ বৈশিষ্ট্যে প্রায় ইংরেজি সাহিত্যই হয়ে যায় - ১৯১২ সনে লন্ডন থেকে

নামে প্রকাশিত হবার পরপর, একবছরের মধ্যেই, সাহিত্যে বিশ্বসেরা নোবেল পুরস্কার লাভ করলো। কাব্যগ্রন্থটি আসলে গীতাঞ্জলি খেয়া নৈবেদ্য শিশু প্রভৃতি কয়েকটি কবিতার বই থেকে বাছাইকৃত কবিতাগুচ্ছের সংকলন। এসময়ে তার ইংরেজ কবি বন্ধু, আরেক নোবেল বিজয়ী ডব্লিউ বি, ইয়েট্স্ এর সহযোগিতা প্রশংসনীয়।

তরুণ বয়সে কয়েকবছর পাশ্চাত্যে কাটাবার সুবাদে এবং বড় হয়ে অন্তত: বারোবার দেশবিদেশ ভ্রমন করে তার বিচিত্র অভিজ্ঞতা হয়েছে। আধুনিক দ্রুত চলমান বিশ্ব, সর্বজনীন চিন্তাধারা এবং পাশাপাশি বাঙালির অনগ্রসরতা, আলস্য, কর্মবিমুখতা ও সহজ জীবন সম্বন্ধে স্বজাতিকে সচেতন করার একাগ্রতা তাকে একজন সমাজসেবী ও সমাজসংস্কারকরূপে প্রমাণিত করেছে। ১৯২১ সনে প্রতিষ্ঠিত রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতী বা শান্তিনিকেতন পরিদর্শন না করলে বোঝা যাবে না তিনি সেই যুগেই, বিংশ শতাব্দীর প্রথম দুই তিন দশকেই, কত অগ্রগামী ছিলেন শিক্ষাদান ব্যবস্থাপনায়, চিন্তাচেতনায়, শিল্পকলা চর্চায় এবং প্রতিটি মানুষকে সম্পূর্ণ মানুষরূপে গড়ে তোলার ভূমিকায়।

তার কল্পনায়, প্রাকৃতিক পরিবেশে শিক্ষালাভ করাতে মানসিক তৃপ্তি ও পূর্ণতা পাওয়া যায়। তার মৌলিকত্বের প্রমাণ মিলে সবকিছুতেই - কী সমাজ কল্যানে, বিশেষ করে পল্লী অঞ্চলে, কী শিক্ষা প্রসারে, কী শিক্ষা দর্শনে, কী শিল্পকল চর্চায়, কী শান্তিনিকেতনে- শ্রীনিকেতন প্রকল্প বাস্তবায়নে। সমাজ ব্যবস্থায় এবং বিশেষ বিশেষ পরিবেশের কোন কোন দিকে লক্ষ্য করতে গিয়ে তার মন মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যায় তার উপন্যাসগুলোতেও--। নৌকাডুবি, ঘরে বাইরে, যোগাযোগ, গোরা চতুরঙ্গ ইত্যাদি কোন শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিকেরই রচিত হতে পারে।

প্রথম সুযোগে, বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পরপর ফেব্রুয়ারি-মার্চে কলকাতা ভ্রমনের সময় বহুদিনের প্রতীক্ষিত রবীন্দ্র-শান্তিনিকেতন দেখে তিন-তিনটা দিন উপভোগ করলাম। অপূর্ব শান্ত প্রাকৃতিক পরিবেশ, উন্মুক্ত তরুতলে পাঠদানের নতুন চিন্তা, ক্লাসে ক্লাসে ছাত্রছাত্রীদের মেঝেতে বসে গান শেখা, বড় খোলা হল ঘরে তাদের নাট্যচর্চা করা বা নির্দিষ্টস্থানে শিল্পচর্চা, চারুকলা এবং কারুশিল্প বা হস্তশিল্প তৈরী, এসবই দেখার মতো।

শ্রীনিকেতনের অপূর্ব কর্মশালাগুলো, প্রদর্শণী ও বিপনী কেন্দ্র ইত্যাদি দর্শন করে দ্রুত কেটে যায় তিনটি দিন। আবারো পরিদর্শন করি পরবর্তী পনেরো বছরে তিনবার এবং সর্বশেষ দেখি সস্ত্রীক গেলো বছর ২০০১ সনের মাঝামাঝি সময়ে। প্রতিবারই মুগ্ধ হয়েছি- ভোরবেলা গেষ্টহাউজের জানালা দিয়ে বিভিন্ন দিক থেকে ভেসে আসতো শিক্ষার্থীদের রবীন্দ্র সংগীতের মধুর, সুললিত ও হৃদয়স্পর্শী সুর; হাঁটতে হাঁটতে কাছে গিয়ে ক্লাসরুমের দরজা বা জানালার অদূরে- শিক্ষার্থীদের আড়াল থেকে- শুনতাম তাদের চর্চা, অতি যত্নের সাথে শিক্ষকদের সংগীত-ব্যাকরণ শেখানো ইত্যাদি। রিকসায় চেপে গোটা ক্যাম্পাসটা ঘুরতে লাগবে চমৎকার। পরপর রবীন্দ্র যাদুঘর বা ঠাকুরবাড়ির ঘরবাড়িগুলোর দোরগোড়ায় যেয়ে যেয়ে দেখতেও চোখ জুড়াবে। এক অবর্ণনীয় আবেগ ও অনুভূতিতে ভরে দিবে যে কোন ট্যুরিষ্টের শ্রান্ত মনটাকে। রবীন্দ্র পিপাসুর তো বটেই। রবীন্দ্রনাথের দুচারটে বই বিভিন্ন স্থানে কিনতে পাওয়া যাবে বোলপুর রেলষ্টেশনের আশেপাশের বইয়ের দোকানগুলোতেও। কলকাতা বা হাওড়া থেকে বোলপুর বা শান্তিনিকেতন রেলভ্রমণটা এসি-সহ প্রথম শ্রেণীতে বেশ আরামদায়ক মনে হবে। সেই ট্রেনে বসে মাটির ছোট ছোট কাপে চা, স্পেশাল সিঙ্গারা বা চানাচুর দারুণ উপভোগ্য।

তার বয়স পঞ্চাশ পার হতেই তিনি শখানিক গ্রন্থ রচনা করেন। অশিতীপর বৃদ্ধ হয়ে তিনি ১৯৪১ সনে মৃত্যুবরণ করেন। এই দীর্ঘ সময়ের পুরোটাই তিনি কাজে লাগিয়েছেন- তার কাব্যগ্রন্থ ৬৫টি, গান ২৫০০টি, ছোট গল্প ১১৯টি, নাটক ৫০টি, ভ্রমণ কাহিনী ও শিশুসাহিত্য ৯টি করে, প্রবন্ধ- আলোচনা-ভাষণ গ্রন্থ ২০টিরও অধিক। এছাড়া, চিঠিপত্র কয়েক হাজার (যার অনেকগুলোই রীতিমতো সাহিত্য) এবং ছবি এঁকেছেন দুই হাজারের মতো।

রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে জানতে হলে তার নিজের লেখা জীবনস্মৃতি বা ছিন্নপত্র বা অজিত কুমার চক্রবর্তী, প্রমথনাথ বিশী বা প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের জীবনীগ্রন্থগুলো যথেষ্ট আলোকপাত করবে। বাংলাদেশেও অনেক সমালোচক, পন্ডিত এবং সাহিত্যিক বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে এই বিশ্বকবির আলোচনা করেছেন। রবীন্দ্রনাথের সঞ্চিতা বা গল্পগুচ্ছ বা গীতাঞ্জলি সাহিত্যসেবী ও সংস্কৃতিবান পরিবারের ঘরে ঘরে শোভা পায়। কে একাধিকবার না পড়েছে তার বিভিন্ন মনস্তাত্ত্বিক, মননপ্রধান ও সামাজিক রাজনৈতিক উপন্যাসগুলো? আর সেই চিরস্থায়ী ছোটগল্পগুলো কি নয় অতুলনীয়! কী বিশালই না সৃষ্টিকর্ম তার - হতে পারে তার সুযোগও ছিলো ঢের; কিন্তু তার চেয়েও বেশী সুযোগের অধিকারী কি আর কেউ ছিলো না? প্রতিভা ও সৃজনশীলতাই তাকে রেখেছে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকদের অন্যতম করে।

রবীন্দ্র সংগীতের চর্চা আধুনিক ও ঐতিহ্যবাহী সবার মাঝেই আদৃত হয়ে আছে। তার সংগীত আজো যেমন জনপ্রিয়, তেমনি প্রাসংগিক; তা এখনো অম্লান, সম্ভবত: থাকবেও চিরঅম্লান। নোবেল পুরস্কার ছাড়াও তার বিশ্বস্বীকৃতি মিলে বহুদেশ থেকে সম্মানসূচক ডি,লিট ডিগ্রির মাধ্যমে; বহু দেশে তাকে নিমন্ত্রণ করে নেয়া - তার কথা শুনবার জন্য - যেখানে তিনি একজন কবি ছাড়াও দার্শনিক, চিন্তাবিদ, সংস্কারক, শিক্ষাগুরু এবং প্রাচ্য সংস্কৃতি ও সভ্যতার প্রচারক। স্বীকৃতির আরেকরূপ তার মৃত্যুর দুইদশক পর, ১৯৬২ সনে ভারত সরকার কর্তৃক

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন। তার সময়ে ১৯২১ সনে প্রতিষ্ঠিত শান্তিনিকেতনে যেমন বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে বহু পন্ডিত, জ্ঞানীগুণীর আনাগোনা ছিলো, তাকেও তেমনি বহু দেশে সম্মান করে নেয়া হয়েছে।

বাংলাদেশে তার অস্তিত্ব নানাভাবে মিশে আছে। তা সেই কুষ্টিয়ার শিলাইদহ বা পাবনার শাহজাদপুর বা যশোরের পতিসর হউক না কেন, বা পদ্মার বোটে, বজরায় হোক না কেন, তার বহু কাব্য, ছোটগল্প ও অন্য রচনা, এসব অঞ্চলে বাংলাদেশের মাটিতে লেখা হয়। রবীন্দ্রনাথের সোনার বাংলাই বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত। তিনি বাঙালি সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ পরিচায়ক, শিল্প মনিষী ও বিশ্বমানব হিসাবে এবং আমাদেরই একজন কবি হিসাবে সকলের হৃদয়ে গাঁথা হয়ে আছেন। রবীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথই- কারো সাথে তার তুলনা হয় না। কেউ তাকে পারবে না অনুকরণ করতে।

[২৫শে বৈশাখ ২০০১। কবির জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে রিয়াদ প্রবাসী সাহিত্যসেবীদের আয়োজিত সভায় পঠিত হয়।]

প্রবন্ধ

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ও বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষিত

ডক্টর এ-কে আব্দুল মোমেন

অন্তর মম বিকশিত করো অন্তর তব হে....
নির্মল করো, উজ্জ্বল করো, সুন্দর করো হে...।

আজ কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৪১তম জন্মজয়ন্তীতে উপরের গানটি বার বার উথলি উঠছে। বাংলাদেশের বর্তমান রাজনৈতিক ও জাতীয় জীবনে অন্তর বিকশিত করার, নির্মল করার এবং সুন্দর করার ডাক এসেছে। আজ সারা দেশে হিংসা, প্রতিহিংসা ও সন্ত্রাসের এক মন-মানসিকতা যেভাবে সর্বস্তরে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে সে থেকে মুক্তির পথ হচ্ছে হৃদয়ের পরিস্ফুটন। তাহলেই এ পংকিল পথ থেকে মুক্তির পথ খুঁজে পাওয়া যাবে।

আজকের বাংলা দেশের প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলসমূহের মধ্যে সহমর্মিতা, সহযোগীতা ও সম্মানবোধ নেই বললেই চলে। প্রাক্তন মন্ত্রী বা জননেতাদের লাঠিপেটা করে নির্যাতন এবং জেলের অভ্যন্তরে বিনা বিচারে আটকাবস্থায় অমানবিক আচরণ করে দম্ভ প্রকাশ নিকৃষ্ট মনেরই পরিচায়ক বৈকি! এ ধরনের অত্যাচার বাংলাদেশের শাসনতন্ত্রের ১১নং অনুচ্ছেদের পরিপন্থীই শুধু নয়, এটা জাতির জন্যে কলংককর, লজ্জাজনক। এ অবস্থা চলতে থাকলে জাতি পিছিয়ে যেতে বাধ্য। যারা এখন শক্তিধর তাদের জানা আছে...

হে মোর দূর্ভাগা দেশ
যাদের করেছো অপমান
অপমান নিতে হবে তাদের সবার সমান
অথবা-
যারে তুমি নীচে দেখ
সে তোমারে বাঁধিবে যে নীচে
পশ্চাতে রেখেছো যারে
সে তোমারে পশ্চাতে টানিছে

আজ বর্হিবিশ্বের বিভিন্ন দেশ অজয়কে জয় করার পথে। সেই একি সময়ে রবিঠাকুরের ভাষায় আমরা এখনো উঠোনের মাচার উপরকার লাউকুমড়ার মোকদ্দমা নিয়েই ব্যস্ত। এ অবস্থা থেকে অবশ্যই বের হয়ে আসতে হবে। এজন্যে সকল দলের, সকল মতের আজ প্রয়োজন দ্বার রুদ্ধ করিওনা, প্রবেশের দ্বার দিয়া প্রবেশ করুক, প্রস্থানের দ্বার দিয়া প্রস্থান করিবে- যেখানে দ্বার রুদ্ধ সেখানে যেন মৃত্যুরও মৃত্যু হইয়াছে। সুতরাং যুক্ত করো হে সবার সঙ্গে, মুক্ত করো হে বন্ধ। সঞ্চার করো সকল কর্মে শান্তি তোমার ছন্দ।

চরণপদ্মে মম চিত্ত নিস্পন্দিত করো হে।
নন্দিত করো, নন্দিত করো, নন্দিত করো হে।

বাংলাদেশে গেল নির্বাচনোত্তর সংখ্যা লঘুদের উপর অমানবিক নির্যাতন এবং গেল কয়েক সপ্তাহ ধরে ভারতের গুজরাটে মুসলমানদের উপর নিধনযজ্ঞ প্রমান করে যে, মানুষের মাঝে অশুভ শক্তি এখনো প্রবল। সকল মানুষ এক আদমের সন্তান একথা কীভাবে আমরা বার বার বিস্মৃত হই? এই ভারতবর্ষে -

হেথায় আর্য, হেথায় অনার্য, হেথায় দ্রাবিড়-চীন-
শক-হুন-দল পাঠান-মোগল এক দেহে লীন

তারপরও কীভাবে আজো আমরা ধর্মের দোহাই দিয়ে মানবহত্যায় মহাব্যস্ত? বরং আমাদের আহবান হওয়া উচিত...

এসো হে আর্য, এসো হে অনার্য, হিন্দু-মুসলমান
এসো এসো আজি তুমি ইংরাজ, এসো এসো খৃষ্টান।
এসো ব্রাহ্মন, শুচি করি মন ধরো হাত সবাকার
এসো হে পতিত, হোক অপনীত সব অপমানভার ।

গেল কয়েকমাসে বাংলাদেশের গ্রামে-গঞ্জে শিশু-কিশোর, বালিকা-গৃহবধু-বৃদ্ধা- এরা যেভাবে লাঞ্চিত হয়েছে, ধর্ষিত হয়েছে তা দেখে নীরবে নিভৃতে কাঁদতে হয়।

শোনো শোনো আমাদের ব্যথা দেব-দেবী প্রভু দয়াময়,
আমাদের ঝরিছে নয়ন, আমাদের ফাঁটিছে হৃদয়।
চিরদিন আঁধার না রয়, রবি উঠে, নিশি দূর হয়,
এ দেশের মাথার উপরে এ নিশিথ হবে নাকি ক্ষয়।
চিরদিন ঝরিবে নয়ন? চিরদিন ফাঁটিবে হৃদয়?
মরমে লুকাবো কত মুখ, ঢাকিয়া রাখিছি ম্লানমুখ
কাঁদিবার নাই অবসর-কথা নাই, শুধু ফাঁটে বুক!
সঙ্কোচে ম্রিয়মান প্রাণ, দশদিশি বিভীষিকাময়!
হেন হীন দীনহীন দেশে বুঝি তব হবে না আলয়।
চিরদিন ঝরিবে নয়ন, চিরদিন ফাটিবে হৃদয়।
কোনো কালে তুলিব কি মাথা, জাগিবে কি অচেতন প্রাণ?
বলো প্রভু, মুছিবে এ আঁখি, চিরদিন ফাটিবে না হিয়া

আজ বাংলাদেশ একটার পর একটা দূর্ণামে জর্জরিত হচ্ছে। এ ক্ষেত্রে অন্যকে দোষারোপ দেয়ার পূর্বে আত্মবিশ্লেষণ প্রয়োজন। প্রথমতঃ সংখ্যালঘু নির্যাতন, দ্বিতীয়তঃ মাহিমা-সাবিনা-সাবরিমা প্রমুখের ধর্ষণ তৃতীয়তঃ অনিয়মের কারণে ফিফার বিশ্বকাপ থেকে বহিস্কার, চতুর্থতঃ ফার ইষ্টার্ন পত্রিকায় তালেবান প্রতিবেদন, পঞ্চমতঃ বিদেশী সরকার দূর্ণীতির অভিযোগ তুলে প্রকাশ্যে বক্তব্য পেশ, ৬ষ্ঠঃ কৃতি সাতারুকে পুলিশের কাষ্টডি থেকে বের করে এনে পানিতে ডুবিয়ে হত্যা, সপ্তমতঃ পরপর পাল্টাপাল্টি দূর্ণীতির শ্বেতপত্র প্রকাশ, অষ্টমতঃ সরকারের সাথে সংশ্লিষ্টদের দূর্ণীতি মামলা থেকে বিনাবিচারে বেকসুর খালাস, নবমতঃ ফুটবল খেলার নামে আদম পাচার, দশমঃ বিভিন্ন মন্ত্রী- মিনিষ্টার প্রমুখের মিথ্যার যথেচ্ছারিতা, তাছাড়া রয়েছে পর পর একাধিক লোকের বিরুদ্ধে দেশদ্রোহিতার মামলা ও কারাগারের ভিতরে অমানবিক অত্যাচার, সম্পত্তি লুট, জমি দখল, অফিস দখল, হাট-বাজার দখল, স্কুল দখল, বাস ষ্টেশন, লঞ্চ ঘাট, রেলপথ দখল এবং অপ্রতিরোদ্ধ সন্ত্রাস, চাঁদাবাজী ও মানুষ হত্যা- এ সমস্ত ঘটনা দেশের ভাবমুর্তিকে যেমন খন্ডিত করেছে একিভাবে জাতির জন্যে বয়ে নিয়ে এসেছে বিপদ, লজ্জা ও অপমান। তাই কবির কন্ঠে কন্ঠ মিলিয়ে বলি- বিপদে মোরে রক্ষা করো, এ নহে মোর প্রার্থনা, বিপদে আমি না যেন করি ভয় বরং বিপদকে যেন করিতে পারি জয় এবং আমি জানি মেঘ দেখে তুই করিস নারে ভয়, আঁড়ালে তার সূর্য হাসে ।

দেশের এই ক্রমঅধঃগতিও দূর্যোগময় অবস্থা থেকে মুক্তির জন্যে সবাই মিলে প্রার্থনা করি-

বাংলার মাটি, বাংলার জল, বাংলার বায়ু, বাংলার ফল-
পূণ্য হউক, পূণ্য হউক, পূণ্য হউক হে ভগবান।
বাংলার ঘর, বাংলার হাট, বাংলার বন, বাংলার মাঠ

পূর্ণ হউক, পূর্ণ হউক, পূর্ণ হউক হে ভগবান।
বাঙালির পণ, বাঙালির আশা, বাঙালির কাজ, বাঙালির ভাষা
সত্য হউক, সত্য হউক, সত্য হউক হে ভগবান।
বাঙালির প্রাণ, বাঙালির সব, বাঙালির ঘরে যত ভাইবোন
এক হউক, এক হউক, এক হউক হে ভগবান।

২৫শে বৈশাখ ১৪০৯বাঙলা
৮ই মে, ২০০২, রিয়াদ

প্রবন্ধ

রবীন্দ্র কাব্যে মৃত্যু ও পরকাল চিন্তা

মেজবাহ্ উদ্দিন জওহের

জন্ম গ্রহনের পর মানুষের জীবনে সত্য বলে যদি কিছু থেকে থাকে তবে তা হলো মৃত্যু। মৃত্যুর মতো অমোঘ সত্য মানব জীবনে আর কিছু নাই। জন্ম থাকলে মৃত্যু থাকবেই, এ যেন একই মুদ্রার এপিঠ আর ওপিঠ।

কবিরা তাই কাব্য করে বলে থাকেন- জন্মরূপ পাপ যখন অনুষ্ঠিত হইয়াছে মরিয়াই সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। অর্থ্যাৎ জন্ম যদি একটি পাপ হয়, মৃত্যু তার প্রায়শ্চিত্ত। জন্ম যদি পূণ্য হয় তাহলে মৃত্যু সেই পুণ্যের ফলভোগ মাত্র।

জন্মের অনিবার্য সহচর এই মৃত্যু সম্পর্ক মানুষের কৌতুহলের শেষ নেই। মৃত্যু কী, মৃত্যুর পর কী এরূপ হাজারো প্রশ্ন মানুষকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়। সৃষ্টির আদিকাল থেকে আধুনিককাল পর্যন্ত সমস্ত চিন্তাশীল মানুষকে এই প্রশ্নগুলি তাড়িয়ে নিয়ে বেড়িয়েছে। ধর্মবেত্তাগন তাদের প্রচলিত ধর্মে যথাসম্ভব এই প্রশ্নের জবাব দিতে চেষ্টা করেছেন। দার্শনিকগন দার্শনিক উপপাদ্যের আলোকে এই প্রশ্নের জবাব খুঁজেছেন।
এতকিছুর পরও মৃত্যু ও পরকাল সম্পর্কে মানুষের ধারনা বহুধা-বিভক্ত ও অমিমাংসিতই থেকে গেছে। এ কথা বোধ হয় নির্দ্বিধায় বলা যায় যে- মৃত্যু বরণ না করা পর্যন্ত মৃত্যুর আসল স্বরূপ উপলব্দি করা মানুষের সাধ্যাতীত। আঁধার ঘরের দরজাটি না খোলা পর্যন্ত ঘরে কী আছে তা দৃশ্যমান হবে না।

মন-মানসে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন একজন মিষ্টিক ভাবধারার কবি, একজন ভাববাদী দার্শনিক তো বটেই। জীবন ও এর রহস্য, মৃত্যু, পরকাল ইত্যাদি চিরন্তন বিষয়গুলি সম্পর্কে তার কৌতুহল ছিল অপরিসীম। একান্ত নিজস্ব দৃষ্টিকোন থেকে তিনি এই প্রশ্নগুলোর জবাব খুঁজতে চেয়েছেন। নিজের জীবনে তিনি অপ্রত্যাশিত কিছু মৃত্যুর সম্মুখীন হয়েছেন যা তাকে গভীরভাবে বিদ্ধ করে। যৌবনের উন্মেষ লগ্নে প্রিয় বৌদি কাদম্বরী দেবীর আত্মহত্যা এবং পরিনত বয়সে স্ত্রী মৃনালিনী দেবীর অকালমৃত্যুর ঘটনা ঘটে । রবীন্দ্রনাথ সবচেয়ে বেশী শোকাহত হয়েছিলেন কনিষ্ঠ পুত্র ছয় বছরের শিশু শমীর মৃত্যুতে। শমী ছিল তার নয়নের মনি । প্রিয়জনদের এই অকাল প্রয়ান জীবন ও জগতের অনিত্যতা সম্পর্কে তার বোধকে আরও বেশী স্পর্শকাতর করে তুলে। শমীর মৃত্যুতে তিনি এতটাই কাতর হয়ে পড়েছিলেন যে প্লানচেটের মতো একটি অবৈজ্ঞানিক প্রথার মাধ্যমে পরজগত সম্পর্কে জানতে সচেষ্ট হন। প্লানচেট একটি প্রথা যার মাধ্যমে মৃত আত্মাদের ডাকা যায় এবং তাদের সাথে কথোপকথন করা যায় বলে বিশ্বাস করা হয়ে থাকে। রবীন্দ্র জীবনী পাঠ করলে দেখা যায়- শমীর মৃত্যুর পর তিনি বেশ কয়েকবার প্লানচেট অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন এবং মৃত প্রিয়জনদের আত্মার সাথে কথা বলার চেষ্টা করেন । এইসব অনুষ্ঠানে তিনি মৃত-আত্মাদেরকে প্রধানতঃ যে সমস্ত প্রশ্ন করতেন- সেই প্রশ্নের মুল সুর ছিল- পরকাল জায়গাটা কীরূপ, মৃত ব্যক্তিরা সেখানে কী অবস্থায় আছেন ইত্যাদি । প্লানচেট যেহেতু কোন বিজ্ঞান-সম্মত পদ্ধতি নয়, সুতরাং প্লানচেটের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য তার অনুসন্ধিৎসুক মোটেও নিবৃত্ত করতে পারে নি- এ কথা বলাই বাহুল্য।

রবীন্দ্র কাব্য পাঠ করলে দেখা যায়, মৃত্যুকে তিনি কখনই ভীতিজনক বা ভয়ংকর কিছু বলে মনে করেন নি । কিশোর বয়সে একটি কবিতায় (মরণ) তিনি মরণকে শ্যামের সাথে তুলনা করেছেন। বলেছেন, - মরন রে তুহু মম শ্যাম সমান । রাধার কাছে কৃষ্ণ যেমন প্রিয়তম, উক্ত কবিতার কবির কাছে মরণও সেইরূপ প্রিয়তম। কিশোর বয়সে (১২৮৮ সাল বাংলা) রচিত এই কবিতাটিকে কিশোর মনের রোমান্টিকতা বা তরলতা বলে উড়িয়ে দেয়া ঠিক হবে না । কারন পরবর্তীতে কবি যখন পরিপূর্ণতা লাভ করেছেন, তার জীবন দর্শন হয়ে উঠেছে পরিপক্ক ও

সুগঠিত- তখনও মৃত্যু ও পরকাল সম্পর্কে তার বোধ খুব বেশী একটা বদলেছে বলে মনে হয় না। বিষয়টি একটু বিস্তৃত ব্যাখ্যার দাবী রাখে।

নৈবেদ্য কবিতা গ্রন্থটি রবীন্দ্রনাথের পরিনত বয়সের রচনা। এই গ্রন্থের জন্ম এবং মৃত্যু কবিতাগুলি মরণ কবিতা রচনার ৬০ বছর পর লিখিত হয়েছে। জন্ম কবিতায় তিনি বলেছেন- জীবনের সিংহদ্বারে পশিনু যে ক্ষণে, এ আশ্চর্য সংসারের মহা নিকেতনে- সে ক্ষণ অজ্ঞাত মোর। কোন এক অদৃশ্য মহাশক্তি আমাকে অজ্ঞাত বিশ্বের মহারণ্যে সামান্য একটি মুকুলের মতো প্রস্ফুটিত করেছে। ।অথচ জন্মপ্রভাতে চোখ খুলেই দেখলাম - চারপাশে অপরূপ পৃথিবী- কনক কিরণে গাঁথা নীলাম্বর পরা। অজ্ঞাত এ রহস্যময় পৃথিবী মুহূর্তের মধ্যেই নবজাত শিশুর কাছে মাতৃবক্ষের মতো একান্ত আপন নিতান্ত পরিচিত বলে ধরা দিল। শিশুর পরম আশ্রয়স্থল যে মায়ের কোল- তা রূপহীন জ্ঞানহীন এক ভীষণ শক্তির মাতৃরূপে প্রকাশ মাত্র। জন্মের মতো মৃত্যুও মানুষের অজ্ঞাত। অজ্ঞাত বলেই মৃত্যু মানুষের কাছে এত ভীতিকর বলে মনে হয়, আসলে মৃত্যু হয়ত তেমন ভয়ংকর নয়। জন্মমুহূর্তে আমাদের অজ্ঞাতে আমাদের ইচ্ছারও পূর্বে- যে শক্তি জগত-সংসারকে এত আপনার করে রেখেছিল, সেই শক্তি হয়তো মৃত্যু প্রভাতেও চিরপরিচিতরূপে আমাদের সামনে হাজির হবে। জন্মের মতো মৃত্যুও মুহূর্তের মধ্যে আমাদের কাছে একান্ত আপন বলে ধরা দেবে-

জীবন আমার এত ভালো বলে হয়েছে প্রত্যয়,
মৃত্যুরে এমনি ভালবাসিব নিশ্চয়

অবোধ শিশুকে মা যখন এক স্তন হতে অন্য স্তনে স্থানান্তর করে তখন শিশু ভয়ে কেঁদে উঠে, কিন্তু মুহূর্তের মধ্যেই দ্বিতীয় স্তনের আশ্বাস পেয়ে শিশুর কান্না বন্ধ হয়ে যায়। জন্ম-মৃত্যু সম্পর্কে আমাদের বোধও ঠিক সেই শিশুর মতো।

স্তন হতে তুলে নিলে কাঁদে শিশু ডরে
মুহূর্তে আশ্বাস পায় গিয়ে স্তনান্তরে ।

রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন- মানুষের রূপময় দেহের ভেতর এক রূপহীন সত্ত্বা বিরাজমান, মৃন্ময়ের মধ্যে চিন্ময়। বাউল বা মরমী কবিরা যার নাম দিয়েছেন- মনের মানুষ বা খাঁচার ভেতর অচিন পাখি । রবীন্দ্রনাথ সেই সত্ত্বাকে কখনও বলেছেন- জীবন দেবতা কখনও বলেছেন- অন্তরতম । তাঁর বিশ্বাস ছিল- মানুষের জীবন দেবতা জীবনবৃত্তের গুরুত্বপূর্ণ- মুহূর্তগুলিতে প্রেমময় মুর্তি নিয়ে মানুষের সামনে প্রকাশিত হবে। পরম কাম্যের মুখদর্শনে মনের সমস্ত ভয় সমস্ত শংকা মুহূর্তেই দূর হয়ে যাবে। জীবন দেবতা সিন্ধু পারে প্রভৃতি কবিতায় এবং অজস্র গানে রবীন্দ্রনাথের এই উপলব্দিই প্রকাশ পেয়েছে-

সেই মধু মুখ, সেই মৃদু হাসি, সেই সুধাভরা আঁখি
চিরদিন মোরে হাসালো কাঁদালো চিরদিন দিল ফাঁকি।
খেলা করিয়াছে নিশিদিন মোর সব সুখে সব দুঃখে
এ অজানা পুরে দেখা দিল পূনঃ সেই পরিচিত মুখে।

উপরের আলোচনা হতে দেখা যায়, রবীন্দ্রনাথের কবি মানসে মৃত্যু পরম রমনীয়রূপে ধরা দিয়েছে। কৈশোর বয়সের রোমান্টিকতায় যে কবি মরণকে শ্যাম-সমান প্রিয় বলে বরণ করেছিলেন, পরবর্তী জীবনে সেই ধারণা আরও সুসংহত হয়েছে মাত্র।

মানুষের জীবন অনন্ত। জন্ম এবং মৃত্যু মানুষের অনন্ত জীবন চক্রের দুইটি সংযোগবিন্দু, এক স্তর হতে অন্য স্তরে প্রবেশের দরোজা। জন্মমৃত্যুকে ভয় করার কোন কারণ না থাকারই কথা। তবুও মাতৃগর্ভস্থ শিশু জন্মমুহূর্তে অনিশ্চিত আশংকায় কেঁদে উঠে। কিন্তু জন্মের পর এক প্রেমময় সত্ত্বা আলোরূপে, বায়ুরূপে, মাতৃবক্ষের অমৃতধারারূপে, বাপ-মায়ের স্নেহরূপে, তার সামনে ধরা দেয়। জীবনকে সে গভীরভাবে ভালোবেসে ফেলে, তার কণ্ঠ হতে উৎসারিত হয়-

দূর্লভ এ ধরণীর লেশতম স্থান
দূর্লভ এ জগতের ব্যর্থতম প্রাণ ।

ঠিক একইভাবে আমরা যখন মৃত্যু দরজা পেরিয়ে অনন্ত জীবনে প্রবেশ করব, সেই প্রেমময় সত্ত্বা মৃত্যু পরবর্তী জীবনেও তাঁর চিরপরিচিত মুখ নিয়ে তার সুধাভরা হাসি নিয়ে আমাদের সামনে হাজির হবে। সুতরাং মৃত্যুকে ভয় করার কিছু নেই। মরণ সম্পর্কে রবীন্দ্র-কাব্যের মূল সুর এটিই।

প্রবন্ধ

২৫ শে বৈশাখ বাঙালির নব জীবন

সবুজ সাগর

২৫ বৈশাখ রবীন্দ্র জন্মোৎসব আমাদের সাড়া জাগায় বিশ্ব মানবতার দিকে। মহামানবের আগমনী সংবাদ ঘোষণা করে, নতুন নতুন বৈচিত্র ও জাগরণকে উদ্বোধন করে সুন্দর আর সমৃদ্ধির দিকে। বিশ্বমানবের জীবন বাণী মূর্ত হয়। সংসারের জীর্ণ সকল কর্ম ও চিন্তার সূত্রকে উদ্দীপ্ত করে।

জন্মদিন পালন প্রথাটা এদেশে রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু, কবির পঞ্চাশতম জন্মদিন উপলক্ষে প্রথম প্রকাশ্য উন্মোৎসব পালিত হয় শান্তিনিকেতনে। উনপঞ্চাশ বছর পার হয়ে পঞ্চাশে পদার্পন ২৫ বৈশাখ ১৩১৭ সাল, এরপর প্রতিবছর রেওয়াজ হয়ে আসছে দেশে বিদেশে। কখনও শান্তভাবে কখনও মহাসমারোহে। বাংলাদেশে অনেকবার রবীন্দ্রজয়ন্তী বিদ্রোহের সূচক হিসেবে পালিত হয়েছে। সে যাই হোক, ১৩১৮সালে প্রথম ঘটা করে রবীন্দ্র জন্মোৎসব পালন করা হয় শান্তিনিকেতনে। কবির পঞ্চাশ বছর পূর্তিতে দেশ-বিদেশ হতে নানা অতিথির আগমন ঘটে, সেবার রাজা নাটকের অভিনয় হয়। তাকে উপলক্ষ করে কলকাতাও জেগে ওঠে, রবীন্দ্রনাথকে প্রথম শান্তিনিকেতনের বাইরে সংবর্ধনা দেয়া হয় ১৪ মাঘ১৩১৮ সালে কলকাতা টাউন হলে। সাহিত্য পরিষদের পক্ষ থেকে কবিকে তর্পন করা হয়। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রেবেদী মহাশয় কবিকে জরির স্তবকের মাল্য পরিয়ে দেন, আর একটি সোনার পদ্মফুল উপহার দেন। কবি তার উত্তরে বলেছিলেন, সাহিত্যে আজ পর্যন্ত আমি যাহা দিবার যোগ্য বলিয়া মনে করিয়াছি তাহাই দিয়াছি, লোকে যাহা দাবি করিয়াছে তাহাই জোগাইতে চেষ্টা করি নাই। আমি আমার রচনা পাঠকের মনের মতো করিয়া তুলিবার দিকে চোখ না রাখিয়া আমার মনের মতো করিয়া তুলিবার দিকে চোখ না রাখিয়া আমার মনের মতো করিয়াই সভায় উপস্থিত করিয়াছি। সভার প্রতি ইহাই আমার যথার্থ।

বিদেশে রবীন্দ্রনাথের জন্মদিন প্রথম পালন করা হয় ১৩২৩ সালে রেঙ্গুনে, তখন বার্মা বর্তমানে ইয়ানমার ভারতবর্ষের অন্তর্ভূক্ত ছিল। রেঙ্গুনবাসী কবিকে একটি রৌপ্যাধারে ছবি মানপস উপহার দিলেন। তৎকালীন রেঙ্গুনের বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব আবদুল করিম জালান ছিলেন সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের মূল স্থপতি, মূলত তার প্রয়াসে এই সংবর্ধনা। তিনি কবিকে সার্বভৌম কবি এই উপাধিতে ভূষিত করেন। অন্য যারা এই উৎসবে ভাষণ দেন তারা হলেন- উ-ব থিয়েন, নির্মল চন্দ্র সেন প্রমুখ।

প্রথম ইউরোপে কবির জন্মোৎসব পালন করা হয় ১৩২৮ সালে, কবি ইউরোপে তখন ভ্রমনরত ছিলেন। তাঁর সঙ্গে বিখ্যাত সকল ব্যক্তিত্বের তখন ভাব বিনিময় ঘটেছে, কবি এন্ড্রুজ সাহেবকে এক পত্রে এ সম্পর্কে লিখলেন,

আজকের দিন যথার্থভাবে আমার জন্য নহে, যাহারা আমাকে ভালবাসে তাহাদেরই আনন্দের। তোমাদের কাছ হইতে দূরে আজিকার এ দিনে আমার কাছে পঞ্জিকার তারিখ মাত্র। আজ এটুকু নিরলা থাকিতে ইচ্ছা করিতেছে ; কিন্তু তাহা হইবার উপায় নাই। সারাদিন অতিথি অভ্যাগতের ভিড় নিরন্তর কথোপকথনের পালা.....।

জেনেভা থেকে কবি দুদিন পর লুসার্নে এলেন, এখানে একদিন থাকার পর সংবাদ পেলেন যে, জার্মানিতে এবার তাঁর জন্মদিন পালিত হয়েছে। সে উপলক্ষে বিশ্বভারতীর জন্য জার্মান ভাষার যাবতীয় শ্রেষ্ঠ গ্রন্থসমূহ প্রত্যেক লেখক ও প্রকাশকরা সংগ্রহ করে উপহার হিসেবে পাঠাচ্ছেন। এ অভাবনীয় সংবাদ পেয়ে বিদ্যুৎ চমকের মত আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন, অচিরে জার্মান বন্ধুদের উদ্দেশে লিখলেন- The generous greeting and gift that have come to me Germany on the occasion of my sixty first birthday are over whelming in their significance for myself. I truly feel that I have had my second birth in my heart of the people of that great country where have accepted me as their own.

১৩৩১ সালে কবি চীন দেশ ভ্রমণে গিয়েছিলেন, ভারতীয় সভ্যতার টান চীনের সমগ্র ভূমিতে জড়িয়ে আছে। তাই চীনে ভ্রমণ তাঁর খুব তাৎপর্যপূর্ণ ছিল। পিকিং এর ক্রিসেন্ট মুন সোসাইটির উদ্যোগে কবির জন্মোৎসব চলে। ক্রিসেন্ট মুন মূলত চীনের বিখ্যাত কবি লি-পো (৭০১-৭৬২ খ্রিঃ) এবং তার কাব্য চেতনায় উদ্ভাসিত। কবি লিপোকে দুনিয়ার সর্বপ্রথম রোমান্টিক গীতি কবি বা লিরিক পোয়েট বলা হয়, যিনি চাঁদ ধরতে গিয়ে হোয়াংহো নদীতে ঝাঁপ দিয়ে মৃত্যুবরণ করেন!! রবীন্দ্রনাথ ইতিপূর্বে লি-পোর কবিতা অনুবাদ করেছেন। তাদের এই জন্মোৎসব পালনে সভাপতিত্ব করেন ড, হুসি। সমগ্র উৎসব চীনা ও ইংরেজি ভাষায় যুগপৎ সম্পন্ন হয়েছিল। পরে রবীন্দ্রনাথকে সোসাইটির পক্ষ থেকে একটি সম্মানিত উপহার সহ জ্ঞ চু তেন তানঞ্চ উপাধিতে ভূষিত করেন, তার অর্থ হল জ্ঞ ভারত মেঘময় বিদ্যুতায়িত প্রভাতঞ্চ । উৎসব শেষে কবির চিত্রার অভিনয় হয়। পরে সেই চিত্রাকে দেশে এসে চিত্রাঙ্গদা নৃত্যনাট্যরূপে সম্পূর্ণভাবে রূপ দেন। ১৩৩২ সালে শান্তিনিকেতনে কবির পয়ষট্টিতম জন্মোৎসব খুব আড়ম্বরের সঙ্গে পালিত হয়। উত্তরায়নের অনুষ্ঠানে জ্ঞপঞ্চবটিঞ্চ রোপিত হয়। শান্তিনিকেতনে এই পঞ্চবটি একটি ইতিহাসখ্যাত ব্যাপার। এ উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ গান রচনা করেছেন। জ্ঞ মরু বিজয়ের কেতন উড়াও শুন্যে হে প্রবল প্রাণঞ্চ সারাদিন নানা অনুষ্ঠানের মাঝে উৎসব আনন্দ আকাশচুম্বি প্রকাশে আকীর্ণ হতে থাকে। পরে সন্ধ্যায় অভিনীত হয় জ্ঞ লক্ষ্মীর পরীক্ষাঞ্চ নাটক।

এর পরের বছর অর্থাৎ ১৩৩৩ সালে শান্তিনিকেতনের আম্রকুঞ্জে মহাসমারোহে কবির জন্মোৎসব পালিত হয়। সেদিন প্রভাতে বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনা এবং সকলে সাজসজ্জায় সজ্জিত। দেশ-বিদেশ হতে বহু গন্যমান্য ব্যক্তিবর্গের সমাবেশ ঘটেছে। সকাল হতেই ছেলে-বুড়ো সৌম্য কাননে উৎসব প্রাঙ্গন ভরে তুলেছে। আম্রকুঞ্জের পল্লবচ্ছায় যেন খুশির জোয়ার বইছে, যথাবিধ মাঙ্গল্যপর্ব শেষ করার পর বিদেশী অতিথিরা প্রথমে কবিকে একে একে সংবর্ধনা জানাতে এগিয়ে এলেন। ফরাসি দেশ থেকে সে দেশের কন্সাল, ইটালীর কন্সাল কবিকে ইটালীতে আমন্ত্রণ জানালেন। জেমস্ পাজিসেস্ সস্ত্রীক এসেছেন শান্তিনিকেতনে, তিনি জাতিতে আইরিশ, আয়ারল্যান্ডের পক্ষ থেকে কবিকে একটি উপহার দিয়ে কবির দীর্ঘায়ু কামনা করেন। বিশ্বভারতীর বিদেশী অধ্যাপকরা এবার একে একে এলেন, চীনা ভাষার ভো লিন চীন থেকে, এন্ড্রুস, দক্ষিণ ও পূর্ব আফ্রিকীয় ভারতীদের পক্ষ থেকে কবিকে সংবর্ধনা জানালেন। পরে কবির সদ্য রচিত নাটক জ্ঞ নটির পূঁজাঞ্চ সেদিন সন্ধ্যায় অভিনীত হয়।

১৩৩৭ সালে কবি ফ্রান্সে থাকাকালে প্যারিসে তাঁর জন্মদিন অনুষ্ঠান পালিত হয়। পরের বছর আবার শান্তিনিকেতনের আম্রকুঞ্জে কবি জ্ঞ প্রণামঞ্চ জ্ঞজন্মদিনঞ্চ ও জ্ঞপান্থঞ্চ এই তিনটি কবিতা আবৃত্তি করে সকলের চিত্ত উদ্ভাসিত করেন। ভাষনে তিনি বলেন, ঞ্চআমার একটি মাত্র পরিচয় আছে, আমি কবি মাত্র আমি আর কিছু নই..... আমি তত্ত্বজ্ঞানী, আমি শাস্ত্রজ্ঞানী, গুরু কিংবা নেতা কিছুই নই, এই ধুলো মাটি ঘাসের ভেতর জীবন ঢেলে গেলাম। যারা মাটির কোলের কাছে আছে, যারা মাটিতে হাটতে আরম্ভ করে, জীবন শেষে মাটিতে বিশ্রাম করে আমি তাদের সকলের বন্ধু, আমি কবি।

১৩৩৯ সালে কবি ইরানে গেছেন ইরানের রাজা রেজা শাহ পাহলভির নিমন্ত্রণে। সঙ্গে ছিলেন প্রতিমা দেবী, অমিয় চক্রবর্তী আর কেদার নাথ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ। ইরান শাহের আগ্রহে খুব জাঁকজমকের সঙ্গে সেবার জন্মদিন পালিত হয়। জ্ঞ বাগনেয়েরে দৌলায়ঞ্চ সমস্ত দিন ধরে চলে উৎসব।

১৩৪৩ সালে কবির ইচ্ছানুযায়ী শান্তিনিকেতনে পয়লা বৈশাখেই কবির জন্মোৎসব পালিত হয়। সেদিন তিনি বিনোদবিহারী পরিকল্পিত জ্ঞ শ্যামলীঞ্চ মাটির গৃহে প্রবেশ করেন। সেদিন থেকে পয়লা বৈশাখে শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্র জন্মোৎসব পালিত হয়ে আসছে।

১৩৪৭ সালে কবি মংপুতে জন্মদিন পালন করেন, এর বর্ণনা মৈত্রেয়ী দেবী মংপুতে রবীন্দ্রনাথ গ্রন্থে তুলে ধরেন। সকাল ১০ টার সময় স্নান করে কালো রংএর জোব্বা পরে বাইরে এসে বসলেন। সেদিন জন্মদিন বলে তিনটি কবিতা লিখেছিলেন। তিনটিই বুদ্ধকে নিয়ে, বিকেল বেলা দলে দলে সবাই আসতে লাগল। গেরুয়া রংএর জামার ওপর মালা চন্দনে ভূষিত আচার্য, সেই সৌন্দর্য সকলকে অভিভূত করে ফেলল।

রবীন্দ্রনাথের শেষতম জন্মদিন পালিত হয়, শান্তিনিকেতনে, ঐতিহাসিক ভাষণ দেন জ্ঞসভ্যতার সংকটঞ্চ সর্বশেষে তিনি বলেন, জ্ঞ এই দারিদ্র পীড়িত লাঞ্চিত প্রাচ্য দেশেই হয়তো এই মহাপুরুষের আবির্ভাব হবে যিনি আগামীকালের মানুষকে বিশ্বব্যাপী ধ্বংস থেকে রক্ষা করতে সমর্থ হবেন।ঞ্চ তারপর সমবেত কণ্ঠে গীত ধ্বণি শুরু হল-

ঐ মহামানব আসে.....

উদয় শিখরে জাগে মা ভৈ, মা ভৈ
নব জীবনের আশ্বাসে।

রবীন্দ্রনাথ আমাদের চিত্তের বিশ্বাস, জীবনের নিঃশ্বাস, আমাদের চিন্তা ও চেতনার সম্রাট, তার অমৃত বাণী আমাদের আগামী দিনের একমাত্র পাথেয়। তার জন্মদিন মানে বাঙালির নব উত্থান, এই দিন বাঙালির চিত্ত হবে মহামানবের উদয় নিশ্চিত।
রবীন্দ্র চেতনার মৃত্যু নেই, বাঙালিরও মৃত্যু নেই। অমর অঝর বাঙালি আছে রবীন্দ্র জন্মের প্রতিটি নব জীবনের আশ্বাসে।

নিবন্ধ

২০০২: একুশ বিনাশী একুশ

হাবিব আজাদ

শিরোনামের প্রকাশ্য সত্য প্রচ্ছন্নতার ছায়া মুছে পরিস্ফুটিত আপন চেতনায়। শুরুতেই মুখোমুখি বলা ভালো হোচট খাওয়া যে পরিবেশে তার নির্মিত ২০০১ এর অক্টোবরে। প্রতি বছরের ন্যায় এক বুক আশা নিয়ে এবারও যাত্রা ছিল পদযুগলের নগ্নতায় পবিত্র ধুলির অলংকার পড়ে মহান শহীদ মিনারে। হা হতোস্মি! বিস্ময়ের আঁছাড় সামলিয়ে নয়ন যুগলের পীড়া ভেদ করে মর্মদহনের অনলকুন্ড ক্রমাগত জ্বালা বাড়াতে থাকলো।

সকাল সাড়ে ১১টায় সরকারীভাবে একুশের আনুষ্ঠানিকতার সমাপ্তি ঘোষিত হলো। ঘোষক, যিনি স্যুট টাই শোভিত কেতাদুরস্থ কালো সাহেব। তার কণ্ঠ নিসৃত অমৃত সুধায় নিমিষে খালি হয়ে গেল ঞ্চ আমার ভায়ের রক্তে রাঙানোঞ্চ শহীদ মিনারের বিশাল চত্বর। বৈপরিত্যের বিসদৃস্য দৃশ্য দেখে সংগিনী বাসায় চলে গেলেন গোস্যা হয়ে। একা দাঁড়িয়ে রইলাম ঠায়। আজো স্পষ্ট মনে আছে গত বছরের কথা। দীর্ঘ লাইন। শুরু হয়েছে সেই আজিমপুর পুরানো গোরস্থান থেকে। সময়ের রশি ধরে দীর্ঘ লাইন অতিক্রম করলাম তীর্থযাত্রীর মত। যখন শহীদ বেদীতে ফুল দিয়ে বেরিয়ে আসলাম তখন দুপুর সাড়ে তিনটা। তারপরও লাইনের দীর্ঘতা হ্রস্যতায় পরিণত হলো না। আর এবার সাড়ে ১১টায় সব শেষ। ছোট ছোট টোকাই বাচ্চারা শহীদবেদী থেকে ফুলের তোড়া এনে পায়ে মাড়িয়ে আনন্দখেলা খেলছে। দর্শক যারা, তখনো ছিলেন শহীদ মিনারের দিকে পিঠ দিয়ে সবুজ চত্বরে বসে, গুলতানি মারছে আর বাদাম বুটও খিরার শ্রাদ্ধ করছেন। এদিক ওদিক যারা ছড়িয়ে ছিটিয়ে তখনো শহীদ মিনারের দিকে তাকিয়ে আছেন। তাদের মাঝে দেখলাম বা দিকের গেটের পাশে মতিয়া চৌধুরী। অনেকেই সালাম দিয়ে তাঁর সাথে কুশল বিনিময় করলেন। ছোট ছোট বাচ্চাদের মাথায় হাত দিয়ে কপালে চুমু খেয়ে তিনি আদর দোয়া করলেন।

আমার মনে পড়ুরো একাত্তরের ১লা মার্চের কথা। ইয়অহিয়ার একটি ঘোষণায় পার্লামেন্টের অধিবেশন স্থগিত হয়ে গেল। ষ্টেডিয়ামে তখন চলছে পাকিস্তান বনাম এম.সি.সি.ঞ্চর ক্রিকেট খেলা। খবরটি শুনে আমরা সবাই দলবেঁধে ষ্টেডিয়াম থেকে বেরিয়ে এলাম ঞ্জয় বাংলাঞ্জধবনি দিয়ে। মুহূর্তে ঘটে যাওয়া গুলিস্তানের মোড় বিশাল জন সমাবেশে পরিণত হলো। কামানের উপর দাঁড়িয়ে অগ্নিকন্যা মতিয়ার চৌধুরী তাঁর অবিস্মরণীয় অগ্নিঝরা ভাষণটি দিলেন। চুল সাদা হয়ে গেছে। পুলিশী পিটুনীতে শরীর অনেকটা অশক্ত। অজান্তে চোখ দিয়ে কফোঁটা পানি গড়িয়ে পড়লো। মনে মনে তাঁর পায়ে প্রণতি রেখে কোন কথা না বলে সংগিনীর হাত ধরে কেটে পড়লাম অন্যদিকে।

দুপুর সাড়ে ১২টা। সবুজ চত্বরের নিচে রাস্তার দুপাশে পসরা সাঁজিয়ে একুশের মেলা বসে গেছে। ইতিউতি মানুষ দেখছে জিনিসপত্র। কেনাকাটা কম। যা একটু ভীড় ফুচ্কার দোকানে সকালের নাস্তার জন্য। শহীদ মিনারের দিকে মুখ করে ঠায় দাঁড়িয়ে আছি। স্মৃতি তাড়ানিয়া দুঃখ জাগানিয়া ভাবনাবিষাদ আমাকে তাড়িয়ে নিচ্ছে দূর হতে দূরে সুদূর অতীতে। গলায় পান-বিড়ি-সিগারেটের ডালা ঝুলিয়ে ফেরীওয়ালা সামনে হাজির। কোনটিতেই আসক্তি নাই শুনেই গেল না সে। দুটি একটি কথা দিয়ে আলাপ জমিয়ে দিলাম তার সাথে। বোঝা গেল সেও আনন্দ পাচ্ছে। দেখা গেল জড়তা কাটিয়ে ফেরীওয়ালাকে কথায় পেয়ে বসেছে। আমিও দোহারকির মত খেই ধরিয়ে দিয়ে নীরব শ্রোতা।
-স্যার।
- এ দেশে আর গরীব থাকবে না।
-আমার জিজ্ঞাসু দৃষ্টিকে অনুসরণ করে-

মোটা চাল আগে ছিল ১১/১২ টাকা। এখন ১৫/১৬ টাকা। দিন দিন বাড়ছেই। গরীবতো এমনিতেই না খেয়ে মরে যাবে। সরকার গ্যাস রফতানী করে বড়লোকদের আমেরিকান গাড়ি দেবে। বাংলাদেশে আর গরীব থাকবে না স্যার।
আমি তাজ্জব বনে গেলাম ওর কথা শুনে। কতক্ষণ ওর মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলাম জানি না। ১ শলা সিগারেট বিক্রির জন্য সে চলে গেল অন্য দিকে। যাওয়ার আগে জানিয়ে গেল সে - সকাল বেলা ৫শত টাকা ধার করে ৪৭৪ টাকার মাল এনেছি স্যার। ১ প্যাকেটও সিগারেট বিক্রি করি নি। এ পর্যন্ত মাত্র ১০টাকা বেচেছি।
কি করে চলবে এ গরীব ফেরীওয়ালা? তাদের মত কোটি কোটি বংগ সন্তানের?? ভাবতে ভাবতে বাংলা একাডেমীর দিকে পা বাড়ালাম।
বাংলা একাডেমী খালি। মঞ্চের সামনে পেতে রাখা শুণ্য চেয়ারগুলি খা খা করছে। অতীত একুশে সারাদিন কবিতা আবৃত্তি চলতো। বিকালে আলোচনা সভা ও সন্ধ্যায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এবার একুশেতে কবিতা আবৃত্তি নেই। হয়তো ছিল সকালে। এখন নেই। ফুটপাত দিয়ে এগিয়ে চললাম হাই কোর্ট মাজারের দিকে। এদিকটায় ও ফুটপাতের দুপাশে পসরা সাজিয়ে বসে গেছে দোকানীরা। কি নেই এ সব দোকানে। মুক্তোর মালা থেকে বই সহ সংসারের খুটিনাটি সবই পাওয়া যায় এ ফুটপাতের মেলায়। প্রেস ক্লাব ডানে রেখে আমার গন্তব্য হোটেল সম্রাট। যার উদ্দেশে যাওয়া সে নেই। অগত্যা এ্যাবাউট টার্ন। বাংলা একাডেমীর গেটের কাছেই দেখি মৌরি মুক্তা স্বাতী দোকানীদের সাথে কলকল করছে। ওরা দেখার আগেই সরে পড়লাম। চেয়ারগুলো এখনো খালি। তবে আমার মত নাছোড়বান্দা দুচারজন বসে আছেন। কেউ পত্রিকা পড়ছেন বা বাদাম চিবুচ্ছেন। আশ্চর্য একুশের ১টা সংকলনও হাতে পাওয়াতো দূরের কথা চোখেও দেখলাম না। ডান পাশের বই মেলা দুপুরের কাকের মত ঝিমুচ্ছে। জ্ঞআমার লাইন হয়ে যায় আঁকা বাঁকা। ভাল না মোর হাতের লেখা।ঞ এ চটুল গানটি শুনেছিলাম বাংলা একাডেমির সাংস্কৃতিক মঞ্চে ২ দিন আগে। গায়কের হেলেদুলে রং ঢং দেখে সংগিনী বললেন চলো উঠি। অন্য কোথাও যাই। শহীদ দিবসে এ গান ছি!!

আজ কি গান শুনাবে কর্তৃপক্ষ জানি না। তবে গুটি গুটি লোকজন আসছে। ঘোষনা হলো আজকের আলোচনা অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করবেন বর্ষীয়ান কবি আবুল হোসেন এবং প্রধান বক্তা ভাষা সৈনিক আবদুল মতিন।যিনি ৫২-র রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে ঞ্চ রাষ্ট্রভাষা মতিনঞ্জ নামে সমধিক পরিচিত ছিলেন। পরবর্তী কালে মাওবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির একটি অংশের নেতৃত্ব দিতে চারু মজুমদারের লাইন অনুসরণ করে দীর্ঘ দিন ভূতলবাসী ছিলেন। আব্দুল মতিনের নাম শুনে আমরা সবাই নড়ে চড়ে বসলাম। বয়সের ভারে সামান্য ন্যুহ্য হয়ে গেছেন। ছোট ছোট পা ফেলে এগিয়ে গেলেন মঞ্চের দিকে। সিঁড়িতে অন্যের কাঁধে ভর দিয়ে মঞ্চে উঠলেন-উপবেশন করলেন। বাংলা একাডেমির সদ্য নিযুক্ত মহা পরিচালক অধ্যাপক মনসুর মুসা তাঁর সদ্যজাত পদের আতুড়ে গন্ধ মেখে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখলেন। তারপর শুরু করলেন অভিজাত কবি আবুল হোসেন। অবসর প্রাপ্ত আমলা কবি বাংলা ভাষার বিবর্তনের আধুনিকতায় আঞ্চলিক প্রভাব নিয়ে জ্ঞঘটিঞ্চ ও জ্ঞ বাঙালেরঞ্চ মধ্যকার বিভেদকে সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দিলেন। আবুল হোসেনের ধ্রুপদী কবিতার সাথে যারা পরিচিত তারা জানেন তাঁর ভাষারীতির আভিজাত্য শব্দ প্রয়োগের সতর্ক মুন্সিয়ানা তাঁর কবিতাকে কতখানি ঋদ্ধ ও সমৃদ্ধ করেছে। জ্ঞআবুল হোসেনঞ্চ ক্লাসিক বাংলা কাব্যাঙ্গনে একটি শ্রদ্ধেয় কবির নাম।

সত্য কথা বলতে কি, আমাদের আগ্রহ ছিল আব্দুল মতিনের কথা শোনার। অসুস্থ বিধায় তিনি বসেই শুরু করলেন। সাবেক পূর্ব পাকিস্তান ও বর্তমান বাংলাদেশের রাজনীতি, রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন অর্থাৎ বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের উত্থান পর্বকালের সার্বিক অবস্থা নিয়ে যারা উৎসাহী বিশেষভাবে বাম রাজনীতি সেই সব ইতিহাস সবেতন লোকজনের নিকট ভাষা সৈনিক আব্দুল মতিন একটি সুপরিচিত নাম। বলা চলে রোমাঞ্চকর নাম। ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী দিনটির তিনি বিস্তারিত হৃদয় বিদারক বর্ণনা দিলেন। যদিও তাঁর বিশদ আলোচনার সব মন্তব্যের সাথে একমত হতে পারিনি। তবে এটাও অনস্বীকার্য যে ব্যক্তি বিশেষকে গ্লোরিফাই করার জন্য অনেক অতিরঞ্জিত কাহিনী ভাষা আন্দোলনের ইতিহাসে যোগ হয়েছে। তবে এটাও সত্য ব্যক্তিক কারিশমা ভাষা আন্দোলনে ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। মতিন সাহেব অকপটে স্বীকার করলেন ভাষা আন্দোলনে ১ম পর্বে তিনি জড়িত ছিলেন না। ২য় পর্বে তাঁর জড়িত হওয়াটাও হঠাৎ করেই। তবে ২য় পর্বের আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায়ে আব্দুল মতিনের বুদ্ধিমত্তা ও সঠিক সময়ে সাহসী সিদ্ধান্ত গ্রহণ আন্দোলনকে বেগবান করেছে এটা সবাই স্বীকার না করলেও নিরেট সত্য। পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতির লেখক বদরুদ্দিন উমর ব্যক্তিগতভাবে ভাষা আন্দোলনের সাথে জড়িত ছিলেন না। তিনি কোলকাতা থেকে বা বর্ধমান থেকে ঢাকা আসেন ১৯৫৩ সালে। তিন পর্বে সমাপ্ত তাঁর বিশাল গ্রন্থটি লেখার উপাদান সংগৃহীত হয়েছে তাজউদ্দিন আহমদের ডায়রী থেকে। অতি সম্প্রতি

২ খন্ডে সমাপ্ত ভাষা সৈনিক শহীদ তাজউদ্দিন আহমদের ডায়রী প্রকাশিত হয়েছে। এ ডায়রীটি প্রকাশিত হওয়ার পর ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতির সঠিক চিত্র উদ্ভাসিত হয়েছে। আব্দুল মতিনের দীর্ঘ বক্তব্যে ভাষা আন্দোলনের পূর্ণাঙ্গ ছবি ফুটে উঠে নাই। তিনি বক্তব্যের মাঝে মাঝে বারবারই বলতে ছিলেন হয়তো আগামী ২১শে ফেব্রুয়ারী

আপনাদের সাথে আর দেখা নাও হতে পারে। কথাটা শুনে বুকের ভেতরটা ব্যথায় মোচর দিয়ে উঠছিল। জীবনে এই প্রথম, বোধহয় এই শেষবার দেখলাম ভাষা সৈনিক আব্দুল মতিনকে। আমার জীবনের একটি অপূর্ণ সাধ পূর্ণ হলো। পাতা ঝরার গান তার কানে রিনিঝিনি বাজছে তখনো তিনি সীমাবদ্ধ গন্ডীর সংকীর্ণতার উর্ধে উঠে মহত্তর উদারতায় বিকশিত হতে পারেন নি। এটা শুধু বাংলা ভাষা ও বাঙালীর জাতীয় ইতিহাসেরই দূর্ভাগ্য নয় সমান দূর্ভাগ্য তাঁর নিজেরও।

টে বেড়াচ্ছেন। দেখা গেল ছোটখাটো মহাদেব সাহাকেও। একটি দোকানে রবীন্দ্র গোপ গুলতানি মারছেন। দেখি ে অচলায়তনের ঘেরা টোপে ঢাকা বই মেলা ঝিমুচ্ছে বুড়োভামের মত। দর্শকক্রেতাদের ভেতর একটি যাই যাই ভাব। ব্যতিক্রম শুধু জ্ঞঅন্যদিনঞ্চ প্রকাশীর সামনে। লম্বা লাইন তরুন তরুনীদের। ঘটনা দেখার জন্য এগিয়ে গেলাম সামনে। দেখি হুমায়ুন আহমেদ বসে আছেন। অটোগ্রাফ দিচ্ছেন তাঁর সদ্য প্রকাশিত বইয়ে। সমুদ্রগুপ্ত হেঁ মলার বাত্তি জ্বলছে আর নিভছে। কী ব্যাপার? মেলা বন্ধ হওয়ার আগাম সংকেত। ঘড়ির কাঁটা তখন ৮টা ছুঁই ছুঁই। তাড়াতাড়ি কিনে ফেললাম ঞ্চ তাজউদ্দিন আহমদের ডায়রীঞ্জ । ৮টায় মেলা শেষ! হায়! আগের দিনতো ১০টা পর্যন্ত আড্ডা মেরেছি। ধাক্কালেও বের করা যেতো না। সে ঞ্চরামও নেই সে অযোধ্যাও নেই।ঞ্জ অগত্যা যাত্রা শুরু পদব্রজে টি, এস, সির দিকে। অন্ধকার টি,এস,সিকে বায়ে রেখে এগিয়ে গেলাম সামনে। মিষ্টি ধোয়া উঠা রসে টইটুম্বর ভাপা পিঠার ভ্রাম্যমান ষ্টলে ভিড় একটু ক্রেতাদের। আধুনিক নগরজীবনে ভাপা পিঠার স্বাদ নেয়া ফুটপাতের দোকানে। কুপি বাত্তির নিম আলোকে পথচলা। চারুকলা ইনষ্টিটিউটের সামনে এসে চোখ ধাক্কা খেল জন সমাগমে। ভেতরে ঢুকেই চমকে উঠলাম। আলো আঁধারিতে বসে আছে হাজারো মানুষ। বকুলবেদীতে বসে আছেন কলা কুশলীরা। পশ্চিম বঙ্গ থেকে আগত শ্যামশ্রী সেন গুপ্ত এখনই গাইবেন। বাংলা একাডেমীর সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা আমার কাছে উপভোগ্য ছিল না গগনবিদারী কর্কস আওয়াজ ও উল্লেখ্য কোন শিল্পীর অনুপস্থির কারণে। কিন্তু এখানে দেখলাম অন্যধারা। বসে গেলাম একটা চেয়ারে। সামনে আর একটি চেয়ারে পা উঠিয়ে পাটা একটু টান করতেই পেছনের সহাস্য দম্পতির চন্দ্রবদন। আস্তে করে পা দুটি নামিয়ে মনোযোগ গানে। কোথা দিয়ে ১০টা বেজে গেল টেরই পেলাম না। ছেলেমেয়ের উৎকণ্ঠিত মুখ ভেসে উঠলো। অতঃপর উঠতেই হলো। পেছনে পড়ে রইলো সেই একুশ যে একুশ আমাকে টানে চুম্বকের মত দূর প্রবাসে। ফেব্রুয়ারী এলেই আমি আনমনা অস্থির হয়ে যাই। সে একুশকে পেছনে রেখে আমার সামনে চলা। কদিন পরে প্রিয়তম মানুষ তিনটি পেছনে রেখে চলে যেতে হবে আরো সামনে।

রিয়াদ প্রবাসী লেখক-লেখিকাবৃন্দ,

বাংলা নববর্ষের প্রাণঢালা শুভেচ্ছা আপনাদের সবাইকে তথা রিয়াদ প্রবাসী সকল বাঙালি ভাইবোনদের। নাবিল হাসান নামাঙ্কিত রিয়াদে বাঙলা বর্ষবরণ-১৪০৯ রিপোর্টটি পড়ে অত্যন্ত প্রীত হলুম। ডক্টর এ-কে আব্দুল মোমেনকে সশ্রদ্ধ অভিবাদন। তাঁর মেধাদীপ্ত লেখনী আমাদের তমশিক মননে অনির্বান মশাল হয়ে জ্বলুক, বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির একজন নগন্য খাদেম হিসাবে এ আমার প্রার্থনা সৃষ্টিকর্তার চরণতলে।

বাংলা নববর্ষ বার বার ফিরে আসুক আপনাদের জীবনে। আপনাদের ঘরও বাহির আনন্দালোকের মঙ্গলালোকে উদ্ভাসিত হোক। অতীতের সকল আবর্জনা ফেলে নববর্ষের আশীর্বাদে সকল বাঙালির,সকল মানুষের হৃদয় শুদ্ধতম হোক-পবিত্রতম হোক।

এ শুভ কামনায়-

হাবিবুর রহমান

সভাপতি

জেদ্দা লেখক গোষ্ঠি

১৫ বৈশাখ-১৪০৯ বাঙলা

২৮-৪-২০০২

ছোট গল্প

জিলানীর ঢাকা সফর

মেজবাহ্ উদ্দিন জওহের

সুমন- শান্তার ছোট্ট সংসারটিতে আবার ছন্দ ফিরে এসেছে।
অফিস থেকে বাসায় ফিরতে এখন আর ভয় করে না, ছুটির দিনগুলিও কেমন হালকা ফুরফুরে মেজাজ নিয়ে আবির্ভূত হয়। অথচ কয়দিন আগেও কী দিনই না গেছে। ধুলোয় মোড়া কিচকিচে চেয়ার টেবিল, ময়লা জামা-কাপড় জানালার পর্দা, শ্যাওলাধরা বাথ রুম, কিচেন থেকে যে গন্ধ ছড়ায় তাতে নিউ মার্কেটের মাছের বাজারও লজ্জা পাবে। সারাদিন অফিসে ভুতের বেগার খেটে বাসায় ফিরতে রীতিমত ভয় করত সুমনের, শান্তার মেজাজ আজ কত ডিগ্রিতে চড়ে আছে কে জানে? বাথরুম ঘষতে যেয়ে হাত কেটে সেদিন বিচ্ছিরি কান্ড, হাত কাটার মূল আসামী যেন সুমন নিজেই। শান্তার কথা- বার্তায় মনে হয় যেন ঢাকা শহর থেকে সমস্ত কাজের বুয়াদের সুমনই তাড়িয়ে দিয়েছে, শান্তাকে শায়েস্তা করার জন্য সুমনই রাজ্যের গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি তৈরী করে রেখেছে।
কোন বুদ্ধিমান স্বামীই স্ত্রীদের এই অভিযোগের প্রতিউত্তর করে নাই। সুতরাং সুমনও মুখ বুজেই সব সহ্য করে যাচ্ছিল। এমন সময় একদিন দুপুরবেলা মধুর সুরে কলিং বেল বেজে উঠল। দরজা খুলতেই দেখা গেল- দুজন রমনী। শান্তা পাকঘরে কী যেন করছিল, কথা শুনে দৌড়ে এসে হামলে পড়ে।

- কাশেমের মা, এই তোমার আক্কেল- এ্যা! সাত দিনের কথা বলে আজ একমাস তোমার দেখা নাই।
- কী করুম আফা, কইন। পছন্দমত লোক খুইজা বাইর করা মুখের কথা না। যাও পাইলাম, মরা হরতালের লাই আইতাম পারি না।

কাশেমের মা নেত্রকোনা-গফরগাঁও অঞ্চলের লোক। পেশায় বুয়া সাপ্লায়ার। সে ভাটি অঞ্চল থেকে কাজের মেয়ে যোগাড় করে ঢাকা শহরে বাসায় বাসায় সাপ্লাই দেয়, রেট মাথাপিছু দুইশ টাকা। এ লাইনে তার প্রচুর সুনাম, তার সাপ্লাই দেয়া মেয়েরা কোন অঘটন ঘটাবে না-সে তার পুরা জিম্মাদার। হাতিরপুল থেকে কমলাপুর--বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে তার কাজকর্ম। শুধু সাপ্লাই দিলেই তার কর্তব্য শেষ হয়ে গেল না, বাসায় বাসায় ঘুরে ঘুরে মেয়েদের খোঁজ-খবর রাখা, তাদের বেতনের টাকা মাসে মাসে দেশের বাড়িতে পৌঁছে দেয়াও তার ডিউটির আওতায় পড়ে। পেশার ব্যাপারে সে অত্যন্ত অনেষ্ট ও দায়িত্বনিষ্ঠ।

প্রথম ঝাপটা কেটে যাওয়ার পর শান্তা এবার তার সওদা পরখ করতে লেগে যায়। কাশেমের মা র আড়ালে হালকা পাতলা গড়নের উনিশ-বিশ বছরের এক ছুকরি মুখ লুকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। গায়ের রং এক কালে ফরসা ছিল বলেই মনে হয়, তবে রোদ-বৃষ্টির অবাধ প্রতাপে তা এখন তাম্রবর্ণ। সদ্য বোটা ছেড়া আমের মত পল্লীর রস এখনও তার গাঁয়ে লেগে আছে-একেবারে গেঁয়ো। বছর দেড়েকের অস্থিচর্মসার এক শিশু ক্যাংগারুর ছানার মত বুকের সাথে লেপ্টে আছে।
শান্তা হতাশ সুরে বলে- এতদিন খুজে পেতে তুমি এইটারে নিয়ে এলে কাশেমের মা? ঐটুক পোনা নিয়ে বাসায় বাসায় কাজ করব? ভারী বয়েসী একজন নিরাছাড়া মানুষ খুজে পেলে না?

- হে চিন্তা আপনের করন লাগত না আফা, আপনের কাম অইলেই অইল। আপনে কাম বুইজা নিবেন, মাস গেলে মায়না দিবেন।

কাশেমের মা প্রফেশনাল লোক, কাষ্টমারকে ফাঁকি দিলে তার বিজিনেস টিকবে না। সে খাটি মালই দিয়েছে এবার। দু দিনেই ঘর-দোরের চেহারা ঘুরে গেল। বাথরুমের ওয়াশ বেসিন গুলি পর্য্যন্ত সাদা ধবধব করছে, ফ্লোর এত পরিস্কার যে পা রাখতে মায়া হয়। স্ত্রীদের কাছে অন্য মেয়েলোকের কাজের প্রশংসা করা উচিত নয়, প্রশংসার হকদার একমাত্র স্ত্রীরা। সুতরাং সুমন বলে- শান্তা, আবার তুমি বাথরুমে হাত লাগিয়েছিলে? একবার হাত কেটেও তোমার আক্কেল হলো না?

- ধ্যাৎ কী যে বলো না, আমি হাত দিতে যাব কেন? বাথরুম জিলানীর মা পরিস্কার করেছে।
- জিলানীর মা আবার কে?
- আমাদের নতুন বুয়া। ঐ যে শালিকের ছানার মত পিচ্চিটা দেখেছ না, তার নাম আবদুল কাদের জিলানী। হাসতে হাসতে শান্তা জবাব দেয়।
- হ্যা, ওদের ব্যাপার স্যাপার ঐ রকমই। ছেলেমেয়েদের বড় বড় সব নাম রাখবে। আমাদের আগের বুয়ার ছেলের নাম মনে আছে-মৈমুর বাদশাহ্!

- মনে থাকবে না কেন, মেয়ের নাম ছিল বানেছা পরি। পুথি থেকে ছেলেমেয়েদের নাম বাছাই করে ওরা। সে যাক গে, আজ কিন্তু তোমার দিবানিদ্রা ষ্টপ, মীরা-মামুন সাড়ে তিনটায় আসবে। পাবলিক লাইব্রেরীতে হুমায়ুনের নতুন ছবির প্রিমিয়ার - মনে আছে তো? আজ দল বেধে ছবি দেখব- ঘুরব। বলো তো- কতদিন হয় আমরা বাইরে যাই না, ঘুরি না।

বলতে বলতে সুমনের কাছে ঘন হয়ে আসে শান্তা। সংসারে একজন কাজের মানুষ না থাকাতে যে তালটা কেটে গিয়েছিল তা আবার মধুর সুরে বাজছে। অলস নিশ্চিন্ত স্বপ্নময় দুপুর, সোনালি যৌবন- এমন দিনে শুধু হারিয়ে যেতেই ইচ্ছে করে, দুজনায় দু জনেতে শুধুই ডুবে থাকা।

একটি অপরূপ সংগীত সন্ধ্যা মনে প্রানে উপভোগ করে সুমন-শান্তা যখন ঘরে ফিরছিল তখন রাত নয়টা। মাথার উপরে ডিসেম্বারের নীল আকাশ, সেখানে দু চারটি তারা মিটমিট করে জ্বলছে। মূত্রগন্ধী ঢাকা শহরও মাঝে মাঝে তার অপরূপ রূপ মেলে ধরে - তরুণ তরুণীদের মনে দোলা দেয়- ভাবে সুমন।

শাহবাগের মোড় ঘুরে সুমনদের রিক্সা হঠাৎ করেই ডানে মোড় নিল। ড্রেনের উপর সারি সারি বস্তি। একটা নারকীয় দুর্গন্ধ সুমনকে সজাগ করে তোলে। একটা কথা তার মনের পর্দ্দায় ঢেউ খেলে যায়- আজকের সংগীত- সন্ধা উপভোগের পেছনে যার অবদান সর্বাধিক, সেই হতভাগ্য মেয়েটি তার শিশু সন্তানসহ এই বস্তির কোন ঘরেই রাত্রি যাপন করছে। এটাই আব্দুল কাদের জিলানি ও তার মায়েদের আবাসস্থল!!

(2)

মোসাম্মৎ সুফিয়া খাতুন ওরফে জিলানির মা র দিনকাল ইদানীং খুব ভাল যাচ্ছে। কয় মাসেই তার চেহারার দিব্বী খোলতাই হয়েছে, আগের সেই হাড় জিরজির ভাব আর নাই। শান্তা তাকে কয়েকটা পুরানো শাড়ী ব্লাউজ দিয়েছে। সেগুলির লাইফ যদিও শেষ তবুও তাতে তাকে ভালই মানায়, ভদ্রলোকের মেয়ে বলে মনে হয়। আজ সে কাজের ফাঁকে শান্তাকে বলল- খালা, আইজ আমারে সকাল সকাল ছুটি দেওন লাগব। শাবানা আফারে দেকফার যামু।

- সেকী, শাবানা আফাটা আবার কে?

সুফিয়া লজ্জিতভাবে বলে- ভুল অইয়া গেছে গা খালা, মানুষ না, বই। বলাকায় একটা বই আইছে- রানী যখন দাসী । বুজি চাইরবার দেখছে। শাবানা আফা যা এ্যাকটিন করছে, চউখ্যের পানি নাকি রাহন যায় না।

সুফিয়ার বুজি যে সে লোক নয়, দারোগা টাইপের এক জবরদস্ত মহিলা। মাসিক একশ টাকা ভাড়ায় তিন হাত বাই চার হাত যে ঝুপড়িটাতে জিলানিরা থাকে, বুজি তার অর্ধেক শেয়ার হোল্ডার। বস্তির কাক-চিলদের ছোবল হতে এ যাবৎকাল বুজিই তাকে বিশ্বস্তভাবে রক্ষা করে এসেছে। সেই বুজির চউখ্যে যখন পানি এসেছে, তখন বইটা যে মারাত্মক তাতে কোন সন্দেহ নাই।

শান্তা ধানের শীষের ভক্ত। বাসায় কাজের মানুষ কেউ নৌকাঘেষা হলে তাকে পটিয়ে পাটিয়ে ধানের শীষে নিয়ে আসাটাকে ছোয়াবের কাজ বলে মনে করে। সেদিন সুফিয়াকে সে প্রশ্ন করে- আচ্ছা সুফিয়া, গত ইলেকশানে তুই কাকে ভোট দিয়েছিলি?

সুফিয়া গ্রাম ছেড়েছে বেশীদিন হয় নাই। শহরের ভাব অর্থাৎ মনের ভাব গোপন করার কালচার এখনও ভালভাবে রপ্ত করে উঠতে পারে নাই। সুতরাং সে খুশীমুখে জবাব দেয়- আমরার দ্যাশে হাছিনার জোর বেশী খালা, হগ্গলে নায়ে ভোট দিছে। গেলবারও নৌকা মার্কা জিতছিল।

শান্তার মেজাজ খারাপ হয়ে যায়। এই ইষ্টুপিড মেয়েটাকে সাইজ করার গুরুদায়িত্ব এখন তার কাঁধে চেপেছে। অবশ্য তাড়াহুড়ার কিছু নাই, নৌকা মার্কা যে কীরূপ খারাপ, ধানের শীষ যে দেশের জন্য কতটুকু মঙ্গলজনক এই গুহ্য তত্ত্বটা মেয়েটার মগজে আস্তে আস্তে ঢোকাতে হবে। এই লক্ষ্যে বেশ কিছুদিন নিরলসভাবে কাজ করে যায় শান্তা। কিন্তু তার মন্ত্র কতটুকু কার্যকরী হয়েছে তার পরিমান সে কিছুতেই বুঝে উঠতে পারে না। হাসিনা-খালেদার তুলনামূলক চিত্র আঁকতে গিয়ে তার গলদঘর্ম অবস্থা, অথচ বোকা মেয়েটা কি না বলে - আমরা মুখ্যসুখ্য মাইয়া মানুষ অত জ্ঞানের কতা বুঝি নি খালাম্মা। ঘরের মাইনষে যেহানে ভোট দিতে কয় সেহানেই সিল মারি ।

সেদিন সুফিয়াকে খুব খুশি খুশি মনে হচ্ছিল। অন্যদিনের তুলনায় কাজ করছিল যেন উড়ে উড়ে। শান্তা জিজ্ঞেস করে- কিরে সুফি, এত খুশি কেন? তোর পা দেখি আজ মাটিতে পড়ছে না, ব্যাপার কি?

লজ্জায় মুখটা নীচু করে ফেলে সুফিয়া। বলে- কী যে কইন খালাম্মা। আমরার আবার খুশি, গুঞ্জারও আবার চিৎ অইয়া শোয়ন। কাইল বিয়ালে জিলানির বাপ আইছে, একটু জল্‌দি ফিরন দরকার - তাই তাড়াতাড়ি করতাছি।

- বলিস কি, হঠাৎ করে তোর সোয়ামি হাজির! তোকে দেশে নিয়ে যেতে চায় নাকি? শান্তার কণ্ঠে উদ্বেগ।
- না না, হেসব কিছু না খালা। দ্যাশে কামকাইজ কিছু নাই, মাসের অর্ধেক দিনই উফাস। দ্যাশে গিয়া কী করতাম? হেতাইন আইছে কিছু টেকা পয়সা নেওনের লাই।
- মানে!
- মাইনষের বাড়িত কামলা দিয়া প্যাট চলে নাগো খালাম্মা। তাই নিয়ত করছি, জিলানির বাপরে যুদি একটা ভ্যান গাড়ি কিইনা দিতে পারতাম। আমার কাছে হাজার টেকা জমছে, আপনে যুদি এই মাসের বেতনডা আগাম দিয়া দেন তাইলে হেতাইনরে মিলঝুল কইরা হাজার দেড়েক টেকা দিয়া বিদায় করতাম পারি।

শান্তা অবাক হয়ে সুফিয়ার কথা শুনছে। একরত্তি এই মেয়েটা জীবনের শত ঝড়ঝাপটাতেও ভেংগে পড়ে নাই, বস্তির পূতিগন্ধময় পরিবেশ তার জীবন সংগ্রামকে একবিন্দু বাঁধাগ্রস্থ করতে পারে নাই। স্বামীপুত্র নিয়ে একটি সোনালি ভবিষ্যতের স্বপ্নাঞ্জন তার চোখ দুটিতে এখনও অম্লান। সেই সংগ্রামী চোখের দিকে তাকিয়ে জীষণ লজ্জা পায় শান্তা।

(3)

গতকাল সুফিয়া কাজে আসে নাই। দোতলার রীমাদের বাসায়ও কাজ করে সে। শান্তা খোঁজ নিয়েছে কাল সেখানেও সে যায় নাই। খবর না দিয়ে কখনও কাজ কামাই করে না সুফিয়া। চিন্তিত মুখে দুপুরের পাকের আয়োজন করছিল, এমন সময় ছেলে কোলে সুফিয়া হাজির। সুফিয়াকে দেখে তেলেবেগুনে জ্বলে উঠাই স্বাভাবিক, কিন্তু তার মুখের দিকে তাকিয়ে শান্তার মুখের কথা যেন মার খেয়ে বন্ধ হয়ে যায়। এ কী চেহারা হয়েছে মেয়েটির!! একটা মাত্র দিন, তার মধ্যে মানুষের চেহারার এমন পরিবর্তনও হয়!

ঝড়ে বিধ্বস্ত এক জনপদ যেন, ঘরদোর সব উড়ে গেছে, গাছগুলি দুমড়ে মুচড়ে একাকার- এখানে সেখানে দু চারটি খামখোটা প্রশ্নবোধক চিহ্নের মত খাপছাড়াভাবে দাঁড়িয়ে আছে শুধু। সুফিয়ার চোখগুলো রক্তজবার মত লাল, মাথার চুল উস্কুখুস্কু। কাপড়-চোপড়ে কাদামাটির দাগ লেগে আছে। কোন এক দূর্দান্ত পশু যেন রাতভর ধর্ষন করে ছিবড়ে করে ফেলেছে মেয়েটিকে।

- কী হয়েছে সুফিয়া, তোর এ হাল হলো কীভাবে? চীৎকার করে উঠে শান্তা।

কিন্তু যে জবাব দেবে তার মুখে কোন কথা নাই, ফুলে ফুলে কাঁদছে শুধু। মায়ের কান্নার সাথে তাল মিলিয়ে জিলানিও মাঝে মাঝে কান্নার চেষ্টা করছে, তবে দেড় বছরের শিশুকে কৃপণ বিধাতা জীবনীশক্তি এতই কম দিয়েছেন যে সে খুব একটা সুবিধা করতে পারছে না। মাঝে মাঝে দু চারটা হেচ্‌কি তুলেই ক্ষান্ত হচ্ছে। অবশেষে আসল ঘটনাটি জানা গেল। সদাশয় সরকার গতকাল তাদের বস্তিটি ভেঙ্গে ফেলেছে, পাপের আঁখড়া নির্মূল করা হয়েছে। নগরবাসীদের জীবনযাত্রা এবার সুখী ও নিরাপদ হবে।

শান্তা বলে- মুখপুড়ি, কাল সারাদিন সারারাত তুই কোথায় ছিলি? বস্তি ভেংগে ফেলেছে বেশ করেছে, তুই আমার বাসায় চলে এলি না কেন ?

সুফিয়া বলল- কী করতাম খালা। সহালে সরদার কইল- হগ্‌গলে মিলা পুলিশরে বাদা দেওন লাগব। তাই সহাল থেইকাই হগ্‌গলে রেডী অইয়া খাড়াইয়া আছিল। পুলিশ আইলেই চোলোগান দিয়া পুলিশের উপর গিয়া পড়ল। পুলিশ গ্যাস ছাড়ল, লাঠি দিয়া পিটাইয়া কয়েকজনের মাথা ফাটাইয়া দিল। খালাগো, আমার বুজিরে পুলিশে ধইরা নইয়া গ্যাছে গা..... ।

- উচিৎ কাম করছে। তোরা ভাড়া দিয়া থাকিস, ভাড়া যারা নেয় তারা পুলিশ ঠেকাক। তোদের পুলিশের সামনে যাওনের কোন কাম আছিল? তোরা পুলিশ মারবি, আর পুলিশ তগো কোলে নিয়া চুমা দিব?
- বস্তি ভাংগার কথা হুইনা হগ্‌গলের মাথায় য্যান বাজ পড়ল গো খালা-- এতগুলা মানুষ কই যাইত। কারও মাথা ঠিক আছিল না খালা, সারাডা রাইত এই দুধের বাচ্চা নইয়া গাছতলায় বইসা রইছি গো.....

সুফিয়াকে নিয়ে বেশ বিপদেই পড়ে যায় শান্তা। তাদের ছোট্ট বাসায় বাড়তি লোকের এমনিতেই জায়গা নাই- তার উপর সুফিয়া নিতান্তই কাচা বয়েসী একটা মেয়ে। ছেলেটাও নোংড়ার একশেষ, যত্রতত্র পেশাব-পায়খানা করে ঘরদোর নোংড়া করে ফেলে। অথচ তাড়িয়েও দিতে পারছে না, আসার পরদিন থেকেই ছেলেটার আকাশ-পাতাল জ্বর। অসহায় একটা মেয়েকে এই অবস্থায় তাড়িয়ে দেয়া যায়?

স্বামী-স্ত্রীতে এই সমস্যা নিয়ে আলাপ হচ্ছিল। সুমন বলল- আমার মনে হয় বাচ্চাটার নিমোনিয়া হয়েছে, বাসায় না রেখে হাসপাতালে পাঠানোই ভাল ছিল।

-এতগুলি টাকার অষুধেও কাজ হবে না কে জানত বাবা। আজকের রাতটা ভালয় ভালয় কাটলে বাঁচি, কাল সকালেই তুমি হাসপাতালে দিয়া আসবা। নিজের জ্বালায় বাঁচি না, তার উপর এইসব উটকো ঝামেলা।

শান্তার একটু ভুল হয়েছিল, জিলানিরা কখনও ঝামেলা করে না। সারাজীবন এরা শুধু দিয়েই যায়, কারও কাছ থেকে পায় না কিছুই। সুতরাং পরদিন হাসপাতাল খোলার আগেই শান্তাদের রেহাই দেয় জিলানি। অনাহার, অবহেলা আর অনাদরের এই পৃথিবী থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় সে, তার ছোট্ট ক্লান্ত চোখদুটি বন্ধ হয়ে যায়।

প্রথম সন্তান হারানোর বেদনায় হতভাগ্য মায়ের আর্তনাদে পৃথিবীর কেন্দ্রে কাঁপন ধরিয়েছিল, কিন্তু মানুষের কানে তা পৌছয় নি। কারন ঠিক সেই সময় রাজপথ দিয়ে শিক্ষিত ভদ্রলোকদের এক বিরাট মিছিল যাচ্ছিল। মিছিল থেকে গগনবিদারী রব উঠছিল- মানি না মানব না, দিতে হবে মানতে হবে। ভেঙ্গে দাও, গুড়িয়ে দাও। পুড়িয়ে দাও । মিছিলের বজ্রকণ্ঠ আওয়াজে এক দুঃখিনী মায়ের আর্তনাদ চাপা পড়ে গেল।।

একটি বিশ্লেষণধর্মী নিবন্ধ

নীরবে নিভৃতে যে কবির জন্ম শতবার্ষিকী চলে যায়

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত জন্ম শতবার্ষিকী

হাবিবুর রহমান

কল্পিত বিষাদে নিমগ্ন সুধীন্দ্রনাথ দত্ত মসৃনতায় সৃষ্টি করেছেন অনবদ্য নিরাশ আঁধারের পংক্তিমালা। তিরিশের নিহিলিজমের যুগ সমীক্ষায় তা হয়তো ছিল সময়েরই দাবী। ত্রিশোর্তীন সমকালীন কাব্য ভবনায় তা আজ পরিত্যাক্ত বিরাণ চরায় পাঠক অজ্ঞাত।

তাই হয়তো কয়েক মাস পূর্বে পার হয়ে যাওয়া কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্তের (১৯০১-১৯৬০)জন্ম শতবার্ষিকী চলে গেল নিরবে নিভৃতচারী কবির কাব্যপ্রতিভার মতই লোকজ্ঞানের অগোচরে। না কোলকাতা, না ঢাকা, কোথাও সোচ্চার নিনাদিত হয়নি যুক্তির দুধারী তলোয়ারের শানিত মনীষায় ভাস্বর নৈরাশ্যের কবি, অভিজাত কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কাব্যালোচনা বা কবি জীবনের স্মৃতিমগ্ন পর্যালোচনা।

অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, তিরিশের দুই যুবরাজের একজন সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, যিনি আধুনিক বাংলা কবিতার ভিতটি সুদৃঢ় ভিত্তিতে স্থাপন করেছিলেন। তাঁর কবিতা বহমান প্রজন্মের কাছে পরিত্যাজ্য দুর্বোধ্যতার অলীক অজুহাতে। অন্য জন বিষ্ণুদে। সুধীন্দ্রনাথের চেয়ে আট বছরের কনিষ্ঠ। বিষ্ণুদে ধ্রুপদ স্বভাবী। গদ্যগুনের সফল প্রয়োগে ঈর্ষণীয় পারঙ্গময়তায় সুধীন্দ্রনাথ তাঁকে সমীহকরে চলতেন। অথচ তিন বছরের জেষ্ঠ জীবনানন্দ দাস সম্পর্কে সুধীন ছিলেন আশ্চর্যরকম ভাবে নিশ্চুপ।

সর্বগ্রাসী রবীন্দ্রপ্রভাব যা আমাদের মননে চিরস্থায়ী আসন গেড়ে বসেছে তাকে শক্ত হাতে নাড়া দিয়েছেন প্রবল দ্রোহে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত কুলোদ্ভুত দুই কবি এক মাইকেল মধুসুধন দত্ত অন্য সুধীন্দ্রনাথ দত্ত। আগের জন প্রাক রাবিন্দ্রিক। আধুনিক বাংলা কাব্য সাহিত্যের জনক। পরের জন রবীন্দ্র বলায় বহির্ভূত কাব্য জগত নির্মানের পথিকৃত। বাংলা কাব্যজগতের রাবিন্দ্রীক চিন্তা বিমুখ দুই যুবরাজ। এক সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, দুই বিষ্ণুদে। কল্লোল যুগের এ তিন মহারথী। জীবনানন্দ দাস রবীন্দ্র পরিমন্ডল থেকে নিজেকে সযত্নে দূরে রেখে আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে কাব্য চর্চায় নিমগ্ন থেকেছেন প্রকৃতি ও নিঃসংগ সৌন্দর্য্যের একাকীত্বের স্বকপোলকল্পিত নৈরাজ্যের সুদুর কল্পলোকে।

সুধীন প্রবলভাবে রবীন্দ্র অস্বীকারের মধ্য দিয়ে ভাববাদাকে দূরে সরিয়ে কঠিন বাস্তবতার নিরিখে শব্দকে যুক্তির কষ্টি পাথরে মেজেঘসে কবিতার শরীর নির্মান করেছেন। যা সাধারন পাঠকের কাছে দূর্বোধ্যতায় পরিচিতি লাভ করেছে। দূর্বোধ্যতা সম্পর্কে সুধীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন ঃ বন্ধু মহলে আমার লেখা দুর্বোধ্য বলে নিন্দিত। হিতৈষীদের বিচারে সংস্কৃতআর ইংরেজী ভাষায় বর্ণসঙ্কর ঘটিয়ে আমি যে অস্পৃশ্য রচনা রীতির জন্ম দিয়েছে, বঙ্গ- ভারতীয় নাটমন্দিরেও সে হরিজনের প্রবেশ নিষিদ্ধ, এবং আত্মনির্ভরের অভাববশতঃই আশি যেকালের গুরুজনদের ভর্ৎসনাভাজন তখন ওই অহেতুক অপবাদকে অমূলক বিবেচনায় উপেক্ষা করা আমার সাধ্যের অতীত।

(সূচনাঃ স্বগত)। অথচ ষাটের দশকের কাব্য পিপাসুদের কণ্ঠে সুধীন দত্তের নাম কবিতার আবেগঘন উচ্চারণঃ
চাই, চাই, আজও চাই তোমারে কেবলই।
আজও বলি,
জনশূণ্যতার কানে রুদ্ধ কণ্ঠে বলি, আজও বলি-

অভাবে তোমার
অসহ্য অধুনা মোর, ভবিষ্যৎ বন্ধ অন্ধকার
কাম্য শুধু স্থবির মরণ।

তারপরও সুধীন্দ্রনাথ দত্ত মূলতঃই নৈরাশ্যের কবি। নাসরিন নঈমের ভাষায় জীবনানন্দ এবং সুধীন্দ্রনাথ দত্ত দুজনেই নৈরাশ্য পীড়িত। এই দুইজন কবির ঋতু হচ্ছে হেমন্ত। যা রিক্ততা ও নৈরাশ্যের প্রতীক। কি প্রেমে, কি দ্রোহে, কি জীবনের অন্যরকম বোধে সর্বত্রই শূন্যতার বেদনা, সর্বত্রই নৈরাশ্যের হাহাকার!! মাধবী পূর্ণিমার রাত বর্ণনা করতে যেয়ে কবি বলেন ঃ

কবিত্ব আমার ধর্ম, তাই বুঝি কৌমুদীজাগরে
পেচকীর দুঃখবাদ লাগে মোর এত মনোলোভা।।
কেমনে তাদের বলি নই আমি আমরা বিলাসী
মর্তের সূচ্যগ্র কোণ একমাত্র অম্বিষ্ট আমার,
ব্রম্মান্ডের সৃষ্টি, স্থিতি, সে সবে এ হৃদয় উদাসী,
উত্থান পতন মর্ম ক্ষণিকার নিষ্ঠায় অসার। (মাধবী পূর্ণিমা ঃ উত্তর ফল্গুনী)

ক্রন্দসী গ্রন্থের অতি বিখ্যাত উট পাখি কবিতাতেও একই সুর এমনকি বসন্ত ঋতুর আবির্ভাবেও তিনি উৎফুল্ল হতে পারেননি। নব বসন্তের রঙিন প্রভাতেও তিনি রিক্ততা উপলব্দি করেছেন।
আজি নব বসন্ত প্রভাতে
চেয়ে দেখি অকস্মাৎ তাহাদের স্থবির প্রয়ান
মোর স্তব্দ যৌবনেরে দিয়ে গেছে বিনষ্টির দান
ধ্বংসের কালিমাক্লিষ্ট নগ্ন, নিঃস্ব বৈধব্য গোপন। (বর্ষ পঞ্চকঃ ক্রন্দসী)

জাকারিয়া শিরাজীর ভাষায় হরিণীর চোখ ও ঝর্ণার উচ্ছল জলধারা নিয়ে তো অনন্তকাল ধরে কবিতা লেখা যায় না। সুধীন কবিতায় আবেগের চেয়ে বুদ্ধিবৃত্তিকে প্রাধান্য দিয়েছিলেন। কবিতা জ্ঞান ও বৌদ্ধিক অনুশীলন দ্বারা শাসিত। সুধীন ছিলেন কোবিদ কবি। শিরাজী সুধীন্দ্রনাথকে আখ্যায়িত করেছেন মডার্নিষ্ট কবি হিসাবে। মালার্মের কাব্যাদর্শই কি সুধীন্দ্রনাথের অনিষ্ট? মালার্মে ও সুধীন দুজনেই ছিলেন নৈরাশ্যবাদী। অবশ্য এ কথা বলাই বাহুল্য নৈরাশ্য ছাড়া কোন মহত সাহিত্য সম্ভবই নয়, ...। শিরাজীর এ মন্তব্যের সাথে ঐক্যমত্য অনেকে প্রকাশ করবেন না। নৈরাশ্যবাদের জন্ম ইউরোপে।

প্রথম বিশ্ব যুদ্ধোত্তর ধ্বংসলীলায় হতাশাগ্রস্থ একদল বুদ্ধিজীবি শুধু সাহিত্য ও সমাজ চিন্তায়ই নয় রাজনৈতিক চিন্তায়ও নৈরাশ্যবাদ বা নিহিলিজমকেই উদ্ধারের একমাত্র অবলম্বন হিসাবে বিবেচনা করেন। তাঁদের আদর্শিক প্রতীকে কোন এক দেবদূত মর্তে অবতরণ করবেন। তাঁর মর্তে আগমনের সাথে সাথেই যাবতীয় দুঃখ বেদনার অবসান হবে। এ ধরণের অবক্ষয়বাদী চিন্তা চেতনার বুদ্ধিজীবিরাই নৈরাশ্যবাদকে ক্লাসিক মর্যাদায় উত্তীর্ণ করেছেন।

অমিত রে এমন কবিতা চেয়েছিল যা মসৃন বা সুললিত নয়; সে চেয়েছিল নতুন কবিতা যা ফুলের মত নয়; বর্শার ফলার মত, ন্যুরালজিয়ার ব্যথার মত. খোঁচাওয়ালা, কোনওয়ালা গথিক গির্জার ছাঁদে, পাটকলের আদলে হলেও হতে পারে। শেষের কবিতায় নায়ক অমিতের মুখ দিয়ে রবীন্দ্রনাথ যে কথা বলেছেন অস্তিত্বের সংকটে নিমজ্জিত সুধীন্দ্রনাথ দত্ত অবচেতনে সে ধারাই অন্বেষণ করেছেন। তিনি বলেন, অভিজ্ঞতার রূপায়নেই কাব্য সাধনা। তিনি আরো বলেন, সংস্কার সাধ্য জেনে, কোন রচনাকে অপেক্ষাকৃত স্থায়ী আকার দিতে আমার বিবেকে বাঁধে। রবীন্দ্র সংগীত সাধিকা সুধীনজায়া রাজেশ্বরী দত্ত কবি বুদ্ধদেব বসুকে উৎসাহিত করেছিলেন সুধীন কাব্য সমগ্র অধ্যয়নে। বুদ্ধদেব বিস্ময়ের সাথে উচ্চারণ করেন কম্প্র হাতে মেলানো পদ্য, ছয় বা আট পংক্তি থেকে দু-তিন পৃষ্ঠা পর্যন্ত ব্যপ্তি তাদের, তাতে বানান অস্থির ও ছন্দ ভঙ্গুর; বাংলা ভাষা ও বাংলা ছন্দ এই দুই অনমনীয় উপাদানের সঙ্গে সংগ্রামের চিহ্ন সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। আসল কথা হলো বহু ভাষায় সুপন্ডিত সুধীন্দ্রনাথ দত্ত বাংলা জানতেন না। তিনি পড়াশুনা করেছেন হিন্দিতে ও ইংরেজিতে। এমনকি তাঁর মায়ের সাথেও হিন্দিতে কথা বলতেন। শুধু সাহিত্য সাধনার জন্যই আপ্রাণ চেষ্টায় তিনি বাংলা শিখেছেন।

বুদ্ধদেব বসু সুধীন্দ্রকে আবিস্কার করেন এইভাবে মাতৃভাষাকে স্বাধিকারে আনতে তাঁর যে বেশী সময় লেগেছিল তাতে অবাক হওয়ার কিছু নেই;..... তার এই পরিণতি স্বরূপ পরবর্তীকালে আমরা দেখতে পাই পথ নামক কবিতার আদি লেখনের প্রতিটি পংক্তি উচ্ছেদ করে তারই ফাঁকে ফাঁকে এক একটি নতুন পংক্তি রচনা করেছেন,

দেখতে পাই সংবতে র ঈশিত্ব, যযাতি র অতুলনীয় কলা-কৌশল। মনন অন্বিষ্টতার কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্ত আধুনিক কবিতা আন্দোলনে বিশ শতকের দীপ্তিময় দাঢ্য পুরুষ। মাইকেল বাংলা কবিতাকে মুক্তি দিয়েছিলেন; অমিত্রাক্ষর ছন্দের বৈভবে কবিতার অর্গল মুক্ত করে কবিতায় গদ্যের প্রাণ পুরুষকে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত শুধু তাঁরই পিতৃপুরুষে প্রত্যাবর্তন করেননি, মাইকেল মধুসুদন দত্ত থেকে আরো অগ্রবর্তী হয়ে রচনা করলেন কাব্যের মুক্তি যা কবি ও কবিতা সমালোচকদের কাছে আধুনিক বাংলা কবিতার ইশতাহাররূপে গৃহীত।

১৯২৮ সালে কোন একটি সাহিত্য সভায় পঠিত কাব্যের মুক্তি" প্রবন্ধে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ইংরেজি সাহিত্যের পারঙ্গম কৃতিমান পুরুষদের কবিতা উদ্ধৃত করে এবং তুলনামূলক বিচার করে ব্রাউনিং, ওয়ার্ডসওয়র্থ ও কোলরিজকে সিদ্ধপুরুষের মাল্য অর্পণ করে বলেছেন, গত শতাব্দির কাব্যমরুতে ব্রাউনিং যে শুধু রোমন্থন করেননি, সৃষ্টির প্রয়াস পেয়েছিলেন তা সহস্রবার স্বীকার্য। ওয়ার্ডওয়র্থ ও কোলরিজ ছাড়া একমাত্র ব্রাউনিং বুঝেছিলেন যে যদি বাঁচতে চায় তবে ধবংসাবশিষ্ট পৈতৃক প্রাসাদের অন্তঃপুরে বসে রূপকথার রাজপুত্রের স্বপ্ন দেখা কাব্যের আর চলবে না।..... উল্লেখ্য আধুনিক ইংরেজি কবিতার জনক টি, এস, এলিয়টকে তিনি এই প্রথম কাব্যের মুক্তি প্রবন্ধে বাংলা ভাষাভাষী পাঠক ও সমালোচকদের কাছে পরিচয় করিয়ে দেন। কঠিন আত্মপরীক্ষায় আকণ্ঠ নিমজ্জিত সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কাব্য সাধনা ছিল বিষাদে কালো। কিন্তু কোন অতিথি অভ্যাগত এলে তাঁর চোখে মেলে যেতো ভালোবাসার আলো।

কল্লোল কবি গোষ্ঠির রোমান্টিক ভাবপ্রবনতা থেকে তিরিশের কবি হয়েও সুধীন্দ্রনাথ সম্পূর্ণ মুক্ত। আবার সমর সেন, সুকান্ত ভট্টাচার্য ও সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের মত মার্কাসবাদে দীক্ষিত না হয়ে বাস্তবতার আধুনিক নাগরিক কবি। যদিও এম, এন, রায় ছিলেন তাঁর ঘনিষ্ঠজনদের অন্যতম। এম, এন, রায়ের ঞ্চ দি মার্কসিয়ান ওয়েঞ্জ নামক পত্রিকার সাথে সংযুক্ত থেকেও মার্কসবাদে যেমন দীক্ষিত হননি তেমনি এম, এন, রায়ের র‍্যাডিক্যাল হিউম্যানিজমের সমর্থন করেছেন কিন্তু তার দ্বারা মোহবিষ্ট হননি।

ধ্রুপদী কবিতা শুধু সীমিত কাব্যপিপাসু ও বুদ্ধিজীবী মহলের জন্যই লিখিত। সুধীন্দ্রনাথ দত্তের এ থিওরী বর্তমানে অচল। সময়ের প্রেক্ষিতে পারফর্মিং আর্টের অংশ হিসাবে রুচিশীল সাধারণ্যেও শুধু কবিতাই নয় ক্লাসিক কবিতা ও বহুল সমাদৃত। কল্পিত বিষাদে নিমগ্ন থেকেও, ভাব বিষাদে নিমগ্ন থেকেও ভাব বিলাসকে পরিত্যাগ করে চৈতন্যের প্রখর রৌদ্রালোকে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর সুনির্বাচিত আরো নির্দিষ্ট করে বললে তাঁর সুচিন্তিত পংক্তিমালা রচনা করেছেন নির্লিপ্ত ধ্রুপদ শব্দ চয়নে। বুদ্ধদেব বসুর ভাষায় কোনোদিকে কোন শান্তনা নেই তাঁর, কোনো আশা নেই, আশ্বাস নেই, মুক্তি নেই। আসক্তি তাঁর দুর্মর বিরহ তাঁর নরক, প্রশান্তি তাঁর মৃত্যু। উটপাখি কবিতায় কবি তাঁর এ মর্মর্মিতা স্পষ্ট-

ফাঁটা ডিমে আর তা দিয়ে
কি ফল পাবে?
মনস্তাপেও লাগবে না
ওতে জোড়া।
অখিল ক্ষুধার শেষে
কি নিজেকে খাবে?
কেবল শূণ্যে চলবে না
আগাগোড়া।
তার চেয়ে আজ আমার
যুক্তি মানো।
সিকতা সাগরে সাধের
তরণী হও।
মরুদ্বীপের খবর তুমিই জানো,
তুমিতো কখনো
বিপদপ্রাজ্ঞ নও।
সব সংসার পাতিগো আবার
চলো।
যে কোন নিভৃত কণ্ঠকাবৃত বনে
মিলবে সেখানে অন্তত
নোনা জলও
খসবে খেজুর মাটির আকর্ষনে।

মাইকেল মধুসূদন দত্তের পর সুধীন্দ্রনাথ দত্তই বাংলা কবিতায় একমাত্র ক্লাসিক্যাল কবি। যেহেতু আধুনিক তরুণ কবিরা মননশীল কবিতায় বিশ্বাসী সেহেতু সুধীন্দ্রনাথ দত্ত তাঁদের অবশ্যই পাঠ্য। সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কাব্য চতুষ্ঠয়, তন্বী, অর্কেষ্ট্রা, ক্রন্দসী ও উত্তর ফাল্গুনী।

কৃতজ্ঞতাঃ সাম্প্রতিক সাহিত্য চিন্তা।

রূপসী চাঁদপুর কাব্যাঙ্গন

রবীন্দ্রনাথকে
ফিরোজ খান

তোমাকে নিয়ে লিখবো বলে
ভাবনার অতলান্তে ডুব দেই নিঃসীম পারাবারে
মন তোমাকে খুঁজে তাই কবিতার
অরূপ সিঁথির ভাজে
আর অবাধ্য হাঁসের মতই হারিয়ে যায়
জীবনের অন্তর্গত সুন্দরের গভীরে।

কবি গুরু তুমি যে অফুরন্ত বিস্ময়!
কাব্যের দিঘিতে তুমি উন্মাতাল ঢেউ
তোমার সাম্রাজ্যে আমি দিকহীন নাবিকের মত
সাতরে চলি সাগরের অসীমতা।

তুমি উত্তরণের সিঁড়ি বেয়ে ভেঙে যাও
শতাব্দির কুহেলিকা দাড়
কুয়াশার পাহাড় ডিঙিয়ে উজ্জল আলো তুমি
ছুঁয়ে যাও তমশার গলি
আর সবই অন্ধকার বিস্মৃত তোমাতে।

কেন যে যুগের চোখ অন্ধ অনুরাগে
অবেলায় বেঁকে যায় চোরাবালি পথে
হৃদয়ের আরশিতে হায় ঢাকে চন্দ্রালোক
চোখ বাঁধা ষাড়ের মতো অহেতুক ক্রুদ্ধতায়
উন্মত্ত মাতম করে কবিতার জমিনে
শালুক জোছনা ঠেলে অর্বাচিন কবি
অন্ধ পুকুরে খেলে ডুব সাতার খেলা।

তুমিতো ছুঁয়ে আছো কাব্যের সপ্তডিঙা নাও
হৃদয়ের গভীর থেকে দৃষ্টির অসীমতায়-
তোমারই অনিরুদ্ধ গতি
কবিতার সিঁড়ি পথ বেয়ে
তুমি উঠে গ্যাছো অলৌকিক সোপানে।

তোমার সংগীত ঘিরে আজো জোনাকী সন্ধ্যা নামে
চাঁদের রূপালী প্রভায় জাগে সুরের মুর্ছনা
তোমাকে ধারণ করেই আলোকিত
কাব্যের ভূবন

আমার উত্তর পুরুষের কাছে
তোমাকে রেখে যেতে চাই বলে
আমি এবং আমরা কিছু মানুষ
আকঁড়ে ধরে আছি কালের পুরোনো-রথ
তোমাকে নিশানা করে
অবিরাম বিনির্মান করি তাই
কবিতার সিঁড়িপথ।

আশি বসন্ত
ফিরোজ খান

(১)

এক কিশোর জ্ঞান বৃক্ষের নীচে ঘুমিয়ে ছিল
সে তো জানতোনা ওটা জ্ঞানবৃক্ষ!
ঘুম ভাঙলে সে নিজের শরীরের দিকে তাকিয়ে
মহাবিস্ময়ে হতবাক্।
সে এখন ৮০ বছরের বৃদ্ধ
তার স্মৃতিতে অতীত যা তার বর্তমান কখনও
ছোঁয়নি তাই ভাসছে শুধু।
তার এই দীর্ঘপথপরিক্রমায় পৃথিবীর উত্থান-পতন
দেখেছে তার চোখ অথচ
সে তা দেখেনি! তাকি হয়?
অদ্ভুত ধাঁধাঁর গোলকে মন তার উথাল-পাতাল
সেকি ঘরে ফিরবে এখন? ঘর পালানো কিশোর
এখন ৮০ বছরের বৃদ্ধ একি নিষ্ঠুর কৌতুক?
চলমান মানুষেরা কেমন করুণার
দৃষ্টি নিয়ে তাকাচ্ছে তার দিকে।
এমন কি এক যুবক তার ঠিকানার

কথা জিজ্ঞেস করে তাকে পৌঁছে দিবে কিনা
এমন কথাও বলেছে

তবে সে কি স্বপ্নে দেখছে এসব!
হায় ভাগ্য একি হলো তার ?
ঘরে যাবে কার কাছে। আশি বছরের
বৃদ্ধের কি ঘর থাকে!
অথচ ঘরের ঠিকানা স্পষ্ট মনে আছে তার

সে বয়েসি জ্ঞান বৃক্ষের গায়ে ঠেস দিয়ে
বসে পড়ে ফের।

(2)

এখন উপায়! নাকি যাবে একবার
তার নিজের গাঁয়ে
অন্তত দেখা হবে আপন তার কেউ
আছে কি না
এমন বয়েসে তার সংসার হবার কথা
কিন্তু হ্যা হতভাগ্য মন কিছুইতো মনে
পড়েনা তার।

তার মনে আছে শিশুবেলা
তার কৈশোরিক উন্মাতাল দিন
তার খেলার সাথীরা কোথায়?
সে জ্ঞান বৃক্ষের শাখার দিকে তাকায়
হঠাৎ কটি মরাপাতা ঝরে পড়লো
তার বুকে
একটি কাঠ ঠোকরা ডালের মধ্যে ঠোট
ঠুকছে অবিরাম
বৃদ্ধ বিহ্বল দৃষ্টি মেলে ধরে পাতার ফাঁক
দিয়ে আকাশে
মেঘহীন শুন্য আকাশ হাভাতের মত
মুখ ব্যাঞ্জনা করে তার প্রতি
সে এখন পথের দিকে তাকায়
এই সেই চেনা পথ।

এ পথে তার নিত্য আনাগোনা কিন্তু সেতো
এক কিশোর বালকের পথ
যৌবনে কোন পথে হেটেছে বৃদ্ধ!
আর পড়ন্ত এই সময় তাকে নিয়ে
এখানে এলো কখন?
বৃদ্ধ উঠে দাঁড়ায়। কষ্ট হয় তার কোমরে
মোচর দিয়ে উঠে
অথচ কৈশোরিক মন নিয়ে দৌড়ের ভঙিমায়
দাঁড়ায় সে
শরীর নুয়ে আসে কিছুটা সম্মুখে
তাই কুজো হয়ে সামনে পা বাড়ায়
পথের ধুলিতে ঝুলে পড়া শরীরের
ছায়া কেঁপে কেঁপে উঠে।

কোথায় যাবে বৃদ্ধ!!
কিন্তু না! একবার তার গ্রামে যাওয়াটা উচিৎ
সে দেখতে চায় তার নিজস্ব কেউ আছে কিনা?
সম্মুখে হাটে বৃদ্ধ
বাহ! ঐতো তার বাড়ি
ঐতো তার ঘর
কিন্তু একি! সেখানে ওরা কারা?
বৃদ্ধ থমকে দাঁড়ায়।
একটি কিশোরী তাকে বাঁকা চোখে দেখে
কিশোরীর ঠোটে প্রশ্নের বান্
ও বুড়ো বাড়ি কোথায়?

(3)

এইতো আমার বাড়ি
কাঁপা কণ্ঠ অথচ স্পষ্ট উচ্চারণে
বলে সে
কিশোরীর বাঁধ ভাঙ্গা হাসি উছলে পড়ে
আরে বলে কি পাগলা বুড়ো
এতো আমাদের বাড়ি
যান যান নিজের বাড়ি যান
হায় কপাল! এত পথ হেটে এসে সেকি নিজের
ঠিকানা চিনলো না!

তার স্মৃতিতে আর এক কিশোরীর মুখ ভেসে
উঠে
টিয়া রং টিপ কপোলে পদ্মরাগ
বরষার প্রথম প্রহরে জলে থৈ থৈ মাঠ-ঘাট
রোকেয়া তাকে বলেছিল-
আমাকে অনেক কদম ফুল পেড়ে দিও
মালা গাথবো তোমার জন্য
সেতো হেসে মরে
কদম ফুলের আবার মালা হয় নাকি
সে তাকে জোছনা রাতে নৌকায় করে
বরণ বিলে নিয়ে যাবে বলেছিলো।
যেখানে জলের আরশিতে
বসে শাপলার হাট।

কোথায় সে ঘাট যেখানে তাদের
ছিপ নৌকা বাঁধা থাকতো!
বৃদ্ধের মন আকুলি-বিকুলি করে উঠে
তার খেলার সাথীরা কোথায়।
তার নিজের গ্রাম।
বাড়ির পাশে কাজলা-দিঘি
গভীর রাতে টুপ-টাপ ঝরে পড়া
হিজল গোটা
ভাদ্র মাসে ধপাস করে তালের পতন জ্যৈষ্ঠের
আম
কুড়ানো, বরণ বিল জলে থৈ থৈ শাপলার ঝিলে
হেটে বেড়ানো
ডাহুক-ডাহুকি

বাবলার ঝোপে ঘুঘুর বাসা
কলমি ফুলে জল সাপ আর
ফড়িং এর নাচানাচি।
সন্ধ্যায় ঝোপে ঝাড়ে জোনাকির মেলা
জলিল মুনশির আজান
ধরণী মাঝির শ্যামা সংগীত
এতচেনা মেঠোপথ এ সবই কি ভুল?
বৃদ্ধ এবার সামনের কবর খানায়
পাশে হেলে পড়া পেয়ারা
গাছটির নিচে বসে পড়ে।
বিভিন্ন গাঁয়ের মানুষ আসা-যাওয়া
করে সে পথে

(4)
ওর দিকে কেউ দেখেও দেখে না
একটা পেয়ারা পেকে আছে
কিন্তু হায়! আশি বৎসরের শরীর কি
পেয়ারা পাড়ে?
অথচ মনে হয় কালই গাছে চড়ে
তন্ন তন্ন করে খুঁজে পায়নি
একটাও পেয়ারা
বৃদ্ধ মুরুব্বিদের কবরকে উদ্দেশ্য করে
সালাম দেয়
আর তখনই কানে ভেসে আসে
আচ্ছালাতু খাইরুম মিনান নাউম.....
কিশোর ঘুম জড়ানো চোখ ডলতে ডলতে

দেউরির বাইরে কলতলায়
এসে দাঁড়ায়
সুবে-সাদেক এর আকাশ কেবল
লালচে রঙ ধরেছে।

এক কিশোরী কুয়াশার আবছা আলো থেকে
নাম ধরে ডাকে
তার শরীরে পুলকের ঢেউ খেলে যায়
এইতো তার গ্রাম তার ঠিকানা
স্বপ্নের কথা ভেবে শিউরে উঠে তার শরীর
আশি বসন্ত তাকে ছুঁয়ে যাক
কখনই চাবেনা সে আর।

হাবিবুর রহমান এর দুটি কবিতা

আমার ঘুম হয় না

আমার দেহের তলে মনের জলে
ডানকানা মাছ কিলবিল করে
ঘুম হয় না ঘর হীন ঘরে শুন্যে ভাসি তেপান্তরে
সব ফুলে যে পুঁজো হয় না সে বুঝেছি চোখের জলে।

নির্ঝরের স্বপ্ন ভংগে আমার ঘুম হয় না
পুরোণো সেই দিনের কথা আমায় ডাকে ভিজা চোখে
ফকির লালন হেঁটে যায় ছেউড়ির আলপথে
রবীন্দ্র তীর্থ সলিলে আমার পুণ্য স্নান হয়নি সারা
আগুনের পরশমনি জ্বালাও যখন শিলাইদহের বোটে
আমি ঘুমাই পদ্মার আউলা বাতাসে।

তুমি রবীন্দ্রনাথ শাল প্রাংশু- ছায়া দাও আমাকে
আমার প্রেমে ও দ্রোহে
আমার সত্তায় ও আত্মার লীলা নিকেতনে
বিরাজ সত্য ও সুন্দর রূপে
তুমি রবীন্দ্রনাথ
২৫ শে বৈশাখে প্রনমি তোমাকে ।।

জেদ্দা, ০১-০৫- ২০০২

(২)

ভালবাসার নদী

তোমরা যারা লড়ছ দেশ হতে দেশে
কাশ্মির হতে ফিলিস্তিনে, গুজরাটে, ফিলিপিন্সে
তোমরা যারা লড়ছ বর্ণে বর্ণে গোত্রে গোত্রে
জাতিতে জাতিতে ধর্মে অধর্মে।

তোমাদের জন্য সুসমাচার নিয়ে এসেছি আমি।
না শান্তির ললিতবাণী তোমাদের শুনাতে চাই না।
মারনাস্ত্র চালানোর গোপন গতিপথও রুদ্ধ করতে চাই না
জাতিসংঘের শীতল রক্তধমনীতে আমি উষ্ণো প্রবাহও চাই না।

আমি তোমাদের জন্য একটি পবিত্র নদী নিয়ে এসেছি।
হ্যা- আমার হাতের মুঠোয় একটি ভালবাসার নদী আছে।
তোমাদের হারিয়ে যাওয়া বিবেককে খুঁজে নিয়ে এসো
এসো অবগাহন কর। তোমাদের হৃদপিন্ডকে বাইরে
নিয়ে এসো। এনে ধৌত কর।

রূপসী চাঁদপুর কাব্যাঙ্গন

মনজুরুল আজিম পলাশ এর দুটি কবিতা

আমাদের কথা

আমরা চলে যেতে চাই দূরে
আমরা ফিরে আসতে চাই
দূর থেকে কাছে

আমরা আমাদের ভালবাসতে চাই
আমরা স্পর্শ করতে চাই
আমাদের অস্তিত্ব
আমরা ঘৃণা করতে চাই আমাদের

আমরা সৃষ্টি করব
আমরা ধ্বংস করব
আমরা নির্মাণ করব সভ্যতা
নতুন সংসার

আমরাই মূলত মালিক হব আমাদের।

যমজ অগ্রজের জন্যে

কষ্ট করতে হয় না
এমনিতেই ভালো থাকি
ভালোলাগার সাথে থাকি
ভালোবেসে ফেলি
কেবল বিশ্বাস করতে চাই।

দিন মাস বছর যুগ নয়
শতাব্দীর পথে চলি।
যখন যে পরিসর
তাকেই স্বর্গ বানাই
পরিসর বাড়তে থাকলে
স্বর্গের সীমানাও বেড়ে যায়
নরকগুলো ফাঁকা পরে থাকবে
শৈশবের এই বিশ্বাস এখনও আছে।

ভালোবাসা থেকেই আমার জন্ম
ভালোবাসতে বাসতেই আমি একা হয়ে যাব
যমজ অগ্রজ
অথবা
তৃতীয় মানুষের খোঁজেই আমার মৃত্যু হবে।

তোমার জন্মজয়ন্তীতে

কাঞ্চন মল্লিক

রবিদা, যা চলে চায় তা ভালো
অমন প্রবচনে তোমায় ভালো বলবো না,
তোমার শিল্প কর্মই তোমায় শিল্পী সত্ত্বার
বিশ্বখ্যাতি দিয়েছে- কবি,
শিল্প-সাহিত্যের এমন কোথায় নেই তুমি?
লিখতে লিখতে সমুদ্র করেছো
শব্দ-বাক্যের বিন্যাস।

সুখের খেয়াকে রেখেছো দূরে
প্রৌঢ়তায় ক্লান্তি আসেনি তোমায়
শব্দ-বিন্যাসে কি বার্ধক্যের দেহখানে।
শুধু ডেকেছো লিখনীর বর্ষনে বেলা-অবেলায়।
কতো বন্যা এসেছিলো!
কতো ঝড়, কতো মৃত্যু!
কতো শীত!
অথচ বসন্তই ছিলো তোমার
চিন্তা চেতনের তেপান্তর।
তুমি ঝড় তুলে দিলে বোশেখীর মতো,
কাব্য-সুরে তান তুলে দিলে জীবনবোধে,
আগুনও জ্বালালে মিথ্যে আর অনিয়মের ভাটে।
কবি, আজো প্রজ্বলিত তোমার জ্বপৃথিবীঞ্চ
সেদিন বাজ পড়া শব্দের মতো কেঁপে ওঠলে
হে কবি, বঙ্গ কাব্যের রবি।
আমাদের ধরে রেখেছো শত প্রেমে
জড়িয়েছো প্রীতির বৃতি-পরাগে
আর সুগন্ধি পুস্প-কাননের ছায়া তলে।
ভুলি নাই কবি ভুলি নাই
ভুলিনাই তোমার কাব্য-শব্দ-চরণ;
আজো পড়ি তোমার কবিতাখানি
কৌতুহল ভরে, কতো অনুরাগে-
হৃদয়ের সুর মেখে ভালোবেসে
আমার শ্রদ্ধাঞ্জলি পঁচিশে বোশাখে।

ভুল হয়ে গেছে

রিংকু সারথি

আত্মায় প্রসিদ্ধ হতে গিয়ে
প্রথমে নিজের প্রেম ভুলে গেছি।

ভুলে থাকা যদি বা সর্বস্ব হতো
আমি সেই ভুল স্নান সেরে
তোমাকে ডাকবো তবে জোছনার মাঠে।

আগুনের চাষ

ইদ্রিস আলী মেহেদী

পথের দু ধার জনশুন্য
এতোক্ষণে সবাই গন্তব্যে পৌঁছে গেছে
কারো অপেক্ষায় ঠাঁয় কেউ নেই।
কথা ছিল অন্ততঃ তুমি
দাঁড়াবে আমার জন্যে নির্দিষ্ট পান্থশালায়।
আমি সারারাত স্বপ্নাতুর ছিলাম তোমার জন্যে,
দূরাগত অশ্বের হ্রেষায় টুটে গেল স্বপ্ন
সঙ্কুচিত হলো দু টি ঠোঁট;

চিবুকের প্রান্ত ছুঁয়ে নামে বিন্দু বিন্দু ঘাম
বাতাসে মিলিয়ে যায়
অপেক্ষার জপনাম।

আমিতো বুঝিনি তুমি চলে যাবে দলবদ্ধ হয়ে।
বিশ্বাসের ভিতে পূতলে জ্বলন্ত অঙ্গার;
সব মাটি আজ হয়ে গেল তামা
আবাদী জমীন কোথায় খুঁজবো বলো?
সবি হলো এলোমেলো;
সদ্য ফোটা ফুলে তোমায় কিভাবে
করবো বরণ - মরণ আমার কাছে
কৃষ্ণকায় ঘিরে আছে চারপাশে।

জ্বলন্ত অঙ্গার পুড়ে পুড়ে নিভেনি এখনো
গোটা বিশ্ব যেন শুধু আগুনের চাষ।

অধ্যাপক হেলাল উদ্দীন আহমদ এর চতুষ্পদী কবিতা

চুম্বন

কবিতার রক্ত শোষণ করে
মশাটা যদি আমাকে কামড়ায়,
তাহলে বেশ মজাই হবে
এমন কামড়ে দুঃখ নাই।

চিড়িয়াখানা

এ পৃথিবী একটা চিড়িয়াখানা
নানান কিসিমের জন্তু আছে,
সবচে' হিংস্র জন্তু মানুষ
অন্য সবই তার পিছে।

চমৎকার

একতলা একটা সুন্দর বাড়ি
ব্যাংকে পঁচিশ লাখ টাকা,
গ্যারেজে একটা সুন্দর 'কার'
চমৎকার ঘুরবে জীবন চাকা।

চিরন্তন

সঙ্গম আর সন্তান উৎপাদন
এটা কোন কীর্তি নয়,
মানব কল্যানের সাধনা করো
কালের বুকে স্মৃতি অক্ষয়।

হে বৈশাখ

হুমায়ুন কবীর

হে বৈশাখ ভুলবো না তোমায়
তুমি যে আছো রবি ঠাকুরের গানে,কবিতায়
তুমি বাকরুদ্ধ বাঙালির বিজয়ের সংস্কৃতি
তুমি রক্তঝরা সিউলি ফোটা প্রভাতের
মিষ্টি রোদের ঝলকানি।

তুমি সাড়ে তের কোটি বাঙালির প্রাণের উল্লাস
তুমি বাঙালির বিরচিত অমর কবিতা
তুমি কবি নজরুলের কালবোশেখীর ঝড়
তুমি সাড়ে তের কোটি বাঙালির নব জাগরণ
তুমি আসো বার বার বর্ষ পরিক্রমায়
এদেশের সবুজ শ্যামল মাটি ও মানুষের কাছে।

তুমি আপন সংস্কৃতি স্মরণ কবিয়ে দেওয়ার এক প্রত্যয়ী ঝান্ডা
তাইতো আমার হৃদয়ের মনিকোঠায়
তোমার স্মৃতির মিনার বাঁচিয়ে রাখবো আমরণ
হে পহেলা বৈশাখ।

অয়ন

দেওয়ান মামুন

ঠাকুর মা র ঝুলির রাক্ষুসের মত মনে হচ্ছে বড় আপুর মুখটা। সামনের উপরের মাড়ির ছয়টা দাঁত এর দুপাশের উচু দুটি অতিরিক্ত। রাগ করে কথা বললে অয়নের রাক্ষুসের ছবি মনে পড়ে। মনে হয় *হাঁউ মাঁউ মানুষের গন্ধ পাঁউ* বলছে আর এগিয়ে আসছে। সন্ধ্যার আগে সাধারণত বড় আপু, সেজ আপু আর ছোট নয়না যার মাথায় ঝুটি করার মত চুল নেই সেও জেদ করে চুল বিনুনী করে দিতে। মার কড়া নিয়ম মাগরেবের আযান শোনার আগেই হাত মুখ ধুয়ে হাতে পায়ে ক্রীম এবং চুল আচরিয়ে ফিটফাট থাকতে হবে। সঙ্গে অযুটাও সেরে নিতে ভুললে রাতের খাবারের ভাগ ১০% এবং যেদিন বিশেষ বিশেষ আয়োজন থাকে তা থেকে বাদ। মাগরেবের নামাজ পড়েই লেখাপড়া, ঠিক এশার আযানের ব্রেক তাও আবার বাথরুম, পানি পান এবং অযুর
বিরতি যাকে বলা যায়।

বড়আপু মুমু, তারপর সেজআপু শিমি, ছোট ভাইয়া সৌরভ, ছোট বোন শশী এবং বড় ভাইয়া শান্ত। শান্ত ভাইয়া বেশ আমুদে। সব সময় একটা না একটা স্বপন্ ঘিরে রাখে মনটাকে। কথায় কথায় দুষ্টামি, হাসি আর ধাঁধাঁর খেলা। বড় ভাইয়া, বড় ও সেজ আপু ড্রইং রুমে মাষ্টারের কাছে পড়ে। অয়স ও সৌরভকে মা পড়ায়। বই পড়ার অভ্যাসটা বড় ভাইয়া শিখিয়েছে, অর্থাৎ বড় ভাই অবসর বা ফাঁক পেলেই বই খুলে পড়তে বসবে। প্রতিদিনের পত্রিকায় যতনা চোখ বোলায় তার চেয়ে বেশী অপেক্ষায় থাকে সাপ্তাহিক সংস্কৃতির পাতার জন্য। কি কি ইংরেজি অডিও সিডি নতুন বের হল। *যায় যায় দিন* দেখাটা শুধু সেই সিডির কারণে।
বড় ভাইয়াকে যদি জিজ্ঞেস করা হয় আজকের পত্রিকার প্রধান সংবাদ কি? তাহলে বড় ভাইয়া নাকটা কুচকে চশমাটা বাম হাতে টেনে একটা নিঃশ্বাস নিয়ে হেসে সামনে যেই থাকুক একটা হাসি উপহার দিয়ে বলবে You Know ? এই খুন, মৃত্যু আমার ভাল লাগেনা। এসব প্রতিদিন পত্রিকায় না থেকে একটা বিশেষ দিন এবং বিশেষ পাতা থাকলে আমাদের মত টিনদের মানসিকতার পরিবর্তন ও পরিবর্ধন আসা সম্ভব বলেই নিজেকে বাঁচাতে স্থান ত্যাগ করেই ডাকবে মুমু। না হলে সৌরভ অথবা কাউকে খুঁজবে সঙ্গ দেবার জন্য। এই বড় ভাইয়া একদিন ছুটির মজা কেমন মজা আর ই করি মিকরি একটা কাগজের প্যাকেটে মুড়িয়ে তাতে সবুজ ফিতা দিয়ে হাট এর মত বাঁধা উপহার দেয় অয়ন এর একাদশ জন্মদিনে। অয়নকে সাধারণত দুপুর একটায় স্কুলের রিক্সা ঘরের দরজায় নামিয়ে দিয়ে যায়। আপুরা আর ভাইয়া প্রায় একই সময় কলেজ ও স্কুল থেকে ঘরে ফিরে আসে।

শিপন আর লুৎফর রিক্সা থেকে নামিয়ে দিয়ে চলে যেতেই অয়নের বুকে ভয়টা আরও চেপে ধরে। আজ গলির বাতিটা জ্বলছে না বলেই অন্ধকার। লক্ষীদের দেয়াল ঘেঁষে যে বটগাছ মনে হয় দৈত্য বিরাট একটা হাত মেলে আছে। অন্ধকারে ডালপালাগুলোকে হাতের আঙ্গুল মনে হয়। অয়ন ভয় পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চোখ দিয়ে দুফোটা পানি গড়িয়ে পড়ল অপরাধ করার কারণে। প্রথম অপরাধ মাগরেব এর আগে ঘরে না ঢোকা, দ্বিতীয় অপরাধ হাত মুখ না ধোয়া আর তৃতীয় অপরাধ স্কুল থেকে এখনও বাড়ি না ফেরা এবং অনুমতি না নিয়ে শিপন আর লুৎফরকে নিয়ে হসপিটালে যাওয়া। আজ নির্ঘাৎ বাবা সহ সকলে মাদুর পেতে বসবে আর অয়ন দাঁড়িয়ে থাকবে পশ্চিম মুখ হয়ে। যেদিন স্কুলের ফুটবল ফাইনাল খেলা হয়েছিল সেদিন মাগরেবের আযান শেষ হবার পর বাসায় ঢোকার আগেই বড় আপু ছাদে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে উঠেছিল মা, বড় ভাইয়া, শিমি দেখে যাও অয়ন আসছে। বড় আপুর গলার আওয়াজ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চোখ তুলে তাকাতেই ড্রাগনের ফুলকি চোখে পড়ে। যা বড় আপুর চোখে খেলা করছে।

যেখানে বাঘের ভয়, সেখানেই রাত হয় প্রবাদ বাক্যটা একদম সত্য মনে হয় সেদিন। আজ নিজেকে বুঝাতে পারেনা। অথচ অংকের মত হিসেব করে দেখেছে যে সব মিলিয়ে লাগবে তিন ঘন্টা। শিপন অংকে সবসময় ১০০ পায়। ওর অংকে অর্থাৎ ঘড়ির কাঁটা ধরে রাস্তায় আসা-যাওয়া মিলে এমন হবার কথা নয়।

অয়নের রাগটা গিয়ে পড়ল হরতালের উপর। হরতাল মানুষের দৈনন্দিন জীবনকে অচল করে দেয়। স্কুল বন্ধ থাকে, অনেক দোকানপাট বন্ধ থাকে। সবচেয়ে বেশী খারাপ লাগে আব্বার মুখটা দেখলে। যেদিন

হরতাল থাকে সেদিন আব্বা, মা, আপুর মুড খুউব খারাপ থাকে। নিয়মের চেয়ে এক ঘন্টা আগে অফিসে রওয়ানা হতে হয় তাও আবার হেটে হেটে সাত কিঃমিঃ। একবার হরতালের দিন প্রচুর বৃষ্টি, সেদিন আব্বা লুঙ্গি ও ফতুয়া পরে কাপড় জামা প্লাষ্টিকের প্যাকেটে করে অফিসে গিয়েছিল। অয়ন সেদিন হাসছিল আর হাসছিল, কেন? অয়ন নিজেই জানেনা। হয়ত আব্বার লুঙ্গি ফতুয়া পড়ে অফিস যাওয়া। অয়নের সেই হাসি বন্ধ হল মা এর কানমলা খেয়ে।

অয়ন বার বার বলছিল যে হাসপাতালে গেলে দেরী হবে। শিপন একবার বলেছিল, থাক তোকে যেতে হবে না, আমি আর লুৎফর যাব। অয়নের ইচ্ছা ছিল কিন্তু বাসায় কাউকে না জানিয়ে যাওয়াটা মনঃপুত হচ্ছিলনা। অয়ন শিপন এবং লুৎফর সেই ক্লাস ওয়ান থেকে প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্থান রাখছে ক্লাস সিক্স অব্দি। কখনও অয়ন, কখনও শিপন কিংবা কখনও লুৎফর একজন আর একজনকে দশমিক পাঁচ অথবা এক এর দূরত্বে দৌড়াচ্ছে। শিপন এর মা বলে এবং টাকাও দিয়ে দিয়েছে যে রিক্সাকরে হাসপতাে আসবে। ঘরের চাবি নিয়ে পিতাকে দেখে বাসায় যাবে। হরতাল যদিও সকালে দুএকটা রিক্সা চলছিল, স্কুল, অফিস খোলা ছিল। শহরে এক রাজনৈতিক নেতাকে আক্রমন করে আহত করার জন্য অর্ধদিবস হরতাল ছিল সেদিন। যতই হরতাল হোক হাসপাতাল হরতাল করতে পারেনা। অয়ন যাবেনা বলাতে শিপনের মুখটা কাল হয়ে যায়। শিপনও আশা করেনি যে অয়ন না বলবে। অয়ন তাৎক্ষণিক বুঝতে পারে যে শিপন ও লুৎফর দুজনেই মনে ব্যাথা পেয়েছে না বলাতে। কিন্তু বাসায় বড়দের কাছ থেকে কোন রকম অনুমতি নেওয়া হয়নি। বড় আপুর ড্রাগন চোখ, মা র কান মলা আর বাবার কামান দাগানো গালাগালকে উপেক্ষা করে অয়ন যেতে রাজী হল। আর সে উপেক্ষা এখন কাঁদাচ্ছে অয়নকে।

গলির মোড় ঘুরতেই চোখে পড়ে মাঝখানের ঘরের বাতি জ্বলছে, আপুদের ঘরের জানালা খোলা বাতি নেই, ড্রইংরুমে বাতি জ্বলছে। ড্রইংরুমে বাতি? অয়ন আশ্চর্য হয়! আজ সোমবার, সপ্তাহের বন্ধের দিন ছাড়া কেউ বেড়াতে আসেনা বা অয়নরা বেড়াতে যায় না, মা তা পছন্দ করেন না। বলেন- সকলের সংসার আছে, স্কুল, কলেজ, অফিস আছে। বেড়াতে যাওয়া মানেই ওদের প্রতিদিনের নিয়মকে অনিয়ম করে দেওয়া। অয়ন কখন এসে মাঝখানের ঘরের জানালার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে টের্ই পেলনা। আশ্চর্য কোন শব্দ নেই। যেন সকলে দম বন্ধ করে রেখেছে। পাশের দোতলা বাড়ি থেকে সৈকত ভাইয়ার গলা শোনা যাচ্ছে- এ প্লাস বি হোল স্কয়ার ইকুয়েল টু..... এ প্লাস বি হোল স্কয়ার ইকুয়েল টু.....। শৈবাল পড়ছে- আমাদের দেশটি নদীমাতৃক। দক্ষিণে রয়েছে বঙ্গোপসাগর..... আশ্চর্য আজ শশীও যেন চুপ করে অয়ন এর অপেক্ষা করতে করতে কথা বলা ভুলে গেছে।

একটু সামনে এগিয়ে বড় ভাইয়ার জানালার কাছে আসতেই এ্যানসিং গ্রুপ এর গান কানে এসে লাগল। অয়ন এর বুকে হাতুড়ি পেটার শব্দ শুরু হল, আজ একি নিয়ম? কেউ পড়ছে না, গান বাজছে। আজতো ছুটির দিন না যে বাইরে বেড়াতে যাবে। মিঠু মামা! মিঠু মামার নামটা মনে আসতে অয়নের বুকে হাতুড়ির শব্দ থেমে গিয়ে অনেকগুলি সাদা কবুতর উড়তে লাগল। পরক্ষণেই সাদা কবুতরগুলি অন্ধকারে হারিয়ে গিয়ে বড়আপুর মুখটা মনে এসে চিৎকার দিয়ে বলছে-হাতের কাছে আয়, দেখাচ্ছি মজা

দোয়া পড়ে বুকে ফুঁ দিয়ে ভাইয়ার ঘরের পার্শ্বে প্রধান দরজায় হাত দিতেই দরজা খুলে গেল। ড্রইংরুমে বাতি জ্বললেও কেউ নেই। এক সেকেন্ড অনেক কথার ভীড়ে মনে পড়ল মিঠু মামার আদর, আর আজ যদি মিঠু মামার সামনে কাল ধরে উঠবস বা কাল মলা খেতে হয় তা হলে মিঠু মামার সামনে অয়ন এর ইজ্জত পাঞ্চার হয়ে যাবে। পর্দার ফাঁক দিয়ে দেখছে অয়ন বেছান মাদুরে শশী অ, আ, বই এর রঙিন পাতা উল্টাচ্ছে বইকে উল্টো করে ধরে। হাসি পেল শশীর কার্যকলাপে। পর্দা কাঁপছে থির থির করে যেমন কাঁপছে অয়নের মন ভয়ে। শশি পর্দার ফাঁক দিয়ে অয়নকে দেখা মাত্র আইয়া আইয়া বলতে বলতে কাঁপা কাঁপা পায়ে উঠে দাঁড়াবার আগেই মা, বড় আপু, শিমু আপু, সৈরঙ যেন অন্ধকারে লুকিয়ে ছিল কমান্ড ষ্টাইলে অয়নকে ঘিরে ধরল। অয়ন দাঁড়িয়ে আছে তবে পায়ে নয় মাথা দিয়ে। অর্থাৎ মাথাটা ভয়ে একমন ওজনে নিচে ঝুকে আছে।

মাথা তোল মা এর গলার আওয়াজ এর সঙ্গে সঙ্গে যেন রবোর্ট হয়ে অয়ন মাথা তুলল। মাথা তোলাটা এবং মাথা তুলে বুক ফুলিয়ে চলাটা বীরের কাজ হলেও এখন মাথাটা এক ভীত মানবের। মা র বাম কাঁধ

এর পেছন থেকে ইট পোড়ার ভাটির আগুন জ্বলছে বড় আপুর চোখে। সেদিন ছিল ড্রাগনের ফুলকি আজ ভাটির আগুন? অয়ন এসব নিয়ে ভাবতে চায়না কারন ক্ষিদেয় পেটে বাতাস দৌড়াচ্ছে। কাঁধে পনের কেজী ওজনের ব্যাগ ঝুলছে। সকলে নিস্তব্দ, নিস্তব্দতার কারন বুঝতেই মনটা হেসে উঠলেও ভয়ে ঠোট দুটি হাসতে পারছেনা। অয়ন নিজেকে প্রস্তুত করে রেখেছে, এখনও করছে, পরীক্ষার আগের রাতের পড়াগুলি রিভাইস দেওয়ার মত। কপালে কি আছে অংকের হিসাব মিলছে না। আব্বাকে দেখা যাচ্ছে না কমান্ড গ্রুপে, নিশ্চয় বড় লাঠি কিংবা বেতের জন্য হন্য হচ্ছে। মামাটা থাকলে একটু ভরসা পেত, ঐ একজনই অয়ন কে ভাল ভাবে বুঝে। আজ মিঠু মামাটাও স্বার্থপরের মত গান শুনছে বসে বসে। মা কোমড়ে শাড়ি পেচাল পাটই দেখল অয়ন। অয়ন এর শরীরে ভয় গুলি আফ্রিকান নাচে নাচছে যতই মা আসছে। অয়ন জ্ঞান হারালেও পাট মনে আছে মা মাথায় হাত দিয়ে বলছে বড়দের অনুমতি না নিয়ে কোথাও যাবে না।

শিশু-কিশোর গল্প

পাপ্পা, মাম্মা এন্ড বেবী বিয়ার

দেওয়ান আবদুল বাসেত

তোমরা জানো ভল্লুক মানেই ভীষণ হিংস্র প্রাণী। মানুষ কিংবা অন্যান্য যে কোন পশু পেলেই ধরে তারা ঘাপুস-ঘুপুস খায়। তবে শুধুমাত্র এমনটি ভাবা কিন্তু ঠিক নয়। কেননা এ সকল চিন্তার ব্যতিক্রম ও কিন্তু রয়েছে। ভল্লুকদেরও হৃদয় আছে। আছে স্নেহ-ভালোবাসা। আছে তাদের নিজেদের ছেলে-মেয়ে। তাই তাদেরও রয়েছে তোমাদের পিতা-মাতার মতোই দয়া-মায়া। কেউ আবার কোন বিপদে পড়ে গেলে ভল্লুকেরা বিপদের লোকদের আক্রমন করে না। বরং ভল্লুকেরা তার সাহায্যে এগিয়ে আসে। কানে কানে অনেক কথাও বলে যায়। এমন কাহিনীও তোমরা পড়েছো।

আজ তোমাদের এক ভল্লুক পরিবারের কথা বলবো। তারা তাদের নিজেদের ছোট্ট একটি ছিম-ছাম বাড়িতে বসবাস করতো। তাদের ছিলো একটি মাত্র মেয়ে। যার নাম তারা আদর করে রেখেছিলো ‘বেবী বিয়ার’। বেবী বিয়ারের পিতার নাম পাপ্পা বিয়ার এবং মাতার নাম মাম্মা বিয়ার। তারা তিনজনে ঘরের তিনটি ছোট্ট আলাদা কামরায় ঘুমাতো। তাদের তিনজনেরই নিজেদের ব্যবহারের আলাদা সব জিনিস-পত্র ছিলো। তারা কেউ কারো ব্যবহারের জিনিস স্পর্শ করতো না।

প্রতিদিন সকালের নাস্তা তৈরী করে তা কিছুটা ঠান্ডা হবার জন্য মাম্মা বিয়ার আলাদা তিনটি বোলে সাজিয়ে রাখতো। সে সকল বোলে সবার আলাদা নামও লেখা রয়েছে। এর পর তিনজনেই বেরিয়ে পড়তো সকালের ‘ফ্রেশ অক্সিজেন’ সেবন এবং কিছুটা ব্যায়াম করার জন্য। কেননা তারা জানতো সকালের সামান্য ব্যায়াম ও ‘ফ্রেশ অক্সিজেন’ সেবন সারাদিন শরীরটিকে রাখে একেবারে ঝরঝরে। যে কোন কাজে পাওয়া যায় দারুণ এনার্জি। সকালের ভ্রমন শেষে তারা সবাই ফিরে এসে নাস্তার টেবিলে বসে একসাথে নাস্তা খেতো। ইহাই ছিলো তাদের নিত্যদিনকার নিয়ম।

একদিন সকালে সবেমাত্র নাস্তা তৈরী করে মাম্মা বিয়ার তিনটি আলাদা বোলে নাস্তাগুলো সাজিয়ে রেখে বেরিয়ে পড়ে তিনজনেই সকালের মুক্ত হাওয়া খেতে। তাদের বেরিয়ে পড়ার মাত্র কিছুক্ষণের পরেই সে বাড়ির পাশ দিয়ে যাচ্ছিলো পাশের গ্রামের দারুণ দুষ্টু রিজা নামের ছোট্ট মেয়েটি। রিজা হঠাৎ করেই খাবারের মৌ মৌ গন্ধ পেলো। সে জানালা দিয়ে উঁকি মেরে ডাকলো -হ্যালো- কেউ কি ভেতরে আছো? একে একে কয়েকবার সে ডাললো। কিন্তু কারো কোন সাড়া-শব্দ না পেয়ে সে দক্ষিনের ভেজানো দরজা ঠেলে ভেতরে প্রবেশ করলো। ঢুকেই সে দেখতে পেলো, একটি খানার টেবিলে তিনটি নাম লেখা বোল সারিবদ্ধভাবে সাজানো রয়েছে। আর তাতে সাজানো রয়েছে অতীব সুস্বাদু যতো খাবার। যার মৌ মৌ গন্ধে সে মাতোয়ারা। তখন তার খিদেও বেশ পেয়েছে।তখনই সে খানা গুলো খেয়ে ফেলতে মানসিক প্রস্তুতি নিলো। কিন্তু পরক্ষণেই সে ভাবলো একেতো সে এ ঘরের লোকদের অনুমতি

ছাড়াই ঘরে ঢুকেছে। এটাই মস্তবড়ো অপরাধ। সেখানে আবার এ ঘরের কারো অনুমতি ছাড়াই তাদের তৈরী খাবার খেয়ে ফেললে অবশ্যই তারা মাইন্ড করবে এবং রাগ করাটিও অস্বাভাবিক কিছু নয়। অতএব সে দ্বিতীয় অপরাধটি করতে যাবে না। তাই সে আবার একে একে তিনটি কামরা ঘুরে দেখলো এবং আওয়াজ দিলো - কেউ কি ঘরে আছো?

না এবারও কারো সাড়া-শব্দ পাওয়া গেলো না। খানার টেবিলে সে আবার নজর ঘুরালো দেখলো, সে খানার পাত্রগুলো হতে এখনো বাস্প উড়ছে। এর অর্থ হচ্ছে খানাগুলো কিছুক্ষণ আগেই তৈরী করে এ ঘরের লোকজন খানা কিছুটা ঠান্ডা হবার জন্যে কাছেই বাহিরে কোথাও গিয়েছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই হয়তো ফিরে আসবে ওরা।

রিজার মাথায় একটি দুষ্টু বুদ্ধি খেলে গেলো। এইতো সুযোগ। এখনই সে খানাগুলো খেয়ে চলে যাবে। টেবিলে রক্ষিত একটি চামচ নিয়ে সে খানার স্বাদ নেবার চেষ্টা করলো। পাপ্পা বিয়ার যে পাত্রে লেখা আছে সে পাত্র হতে সে কিছু খাবার মুখে দিলো। ওরে বাপরে এ দেখি খুবই ঝাল্। এগুলো খাওয়া সম্ভব নয়। সে মাম্মা বিয়ারের পাত্রে চামচ ডুবিয়ে সেখান থেকে কিছু খাবার নিয়ে টেষ্ট করলো। না এগুলোও খাওয়া সম্ভব নয়। কেন না তা ছিলো খুবই টক্। বেবী বিয়ারের পাত্রে সর্বশেষে সে চামচ দিয়ে কিছু খাবার নিয়ে মুখে দিলো। ...ওয়াও... ইহা একেবারেই পারফেক্ট। যেমন কিছু গরম আছে তেমন এ খানাগুলো বেশ মিষ্টি এবং নরম। তাই তড়িঘড়ি ঘাপুস ঘুপুস করে পাত্রের খানাগুলো সাবাড় করে দিলো সে।

খানা শেষে দাঁত ব্রাস করা দরকার। সে খুঁজলো। না সে কোন ব্রাস খুঁজে পেলো না। খাবারের সে ক্লান্তি অনুভব করলো। একটু বসে বিশ্রাম করা দরকার। সে দেখলো তিনটি চেয়ার সাজানো। প্রত্যেকটিতে আলাদা নাম লেখা আছে। পাপ্পা বিয়ার, মাম্মা বিয়ার, বেবী বিয়ার। রিজা পাপ্পা বিয়ারের চেয়ারে বসলো। না এতে আরাম পাওয়া যাচ্ছে না। কেন না ইহা যেমন বড়ো তেমনি শক্ত। সে মাম্মা বিয়ারের চেয়ারে বসলো। না এটাও মজার নয়। ইহা যেমন বেশী নরম তেমনি বড়ো। অতএব সে বেবী বিয়ারের চেয়ারে বসলো। সে তাতে মজা পেলো। কেননা সেটা খুব নরমও নয় খুব শক্তও নয়। কিন্তু বসার কিছুক্ষণের মধ্যেই সেই ছোট্ট চেয়ারটি ভেঙ্গে সে ধপাস করে মেঝেতে ছিটকে পড়লো। হাতে মাঝায় সে কিছুটা ব্যথা পেলো। সে ভাবলো এ চেয়ারটিও তার জন্য বসার উপযুক্ত ছিলো না।

এখন রিজা ঘুমের ক্লান্তিতে ঢুলু ঢুলু। ঘুম পরীদের কাছে যত্ত ঘুম ছিলো সবই যেন একসাথে এসে তার দু চোখে চেপে ধরেছে। সে এবার মনস্থির করলো যে ভাবেই হউক কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে শরীরটাকে ঝরঝরে করে নিতে হবে। সে বেমালুম ভুলে গেছে যে বর্তমানে সে পরের বাড়িতে রয়েছে। যেখানে সে একটির পর একটি অপরাধ করে চলছে। যেকোন মুহুর্তে সে এবাড়ির লোকজনের কাছে ধরা পড়ে শাস্তি পেতে পারে। ঘুমের নেশায় সে সব ভুলে গিয়ে পাপ্পা বিয়ারের বেডরুমে গিয়ে শুয়ে পড়ে ঘুমাবার চেষ্টা করে।

- ও মাই গড্। এ দেখছি খুবই শক্ত। এখানেতো ঘুমানো যাবে না। এর পরে সে মাম্মা বিয়ারের কামরাতে গিয়ে তার বেডে শরীরটি এলিয়ে দিতেই রিজা যেন ডুবে গেল। মানে বেডটি ছিলো খুবই নরম তাই তাতেও তার ঘুমানো সম্ভব হলো না। সর্বশেষে সে বেবী বিয়ারের বেডে শুতেই আরাম পেয়ে গেলো। যা বেশী নরমও নয় বেশী শক্তও নয়। স্বল্প সময়ের মধ্যেই সে দিলো এক নাকডাকা লম্বা ঘুম। পাপ্পা, মাম্মা এবং বেবী বিয়ার প্রভাতী ভ্রমণ শেষে ঘরে ফিরে এসে দেখে দরজা খোলা। তাতে তারা অবাক হয়! তবে কি তাদের অবর্তমানে কোন চোর ডাকাত ঘরে ঢুকেছে?

না না । এ বনের কার এমন বুকের পাটা যে তারা বিয়ারের ঘরে ঢুকে! তবুও তারা সচেতনতা নিয়েই ঘরে ঢুকে সোজা ডাইনিং টেবিলে রক্ষিত খাবারের অবস্থা দেখে মনে প্রচন্ড এক হোচট খেলো। পাপ্পা বিয়ার এবার বললো- নিশ্চয়ই কেউ আমাদের ঘরে এসেছিলো। কিন্তু কে আসতে পারে? তবে কি বেড়াল, কুকুর নাকি শেয়ালদের কেউ ভুলে এখানে ঢুকে পড়েছিলো।
মাম্মা বিয়ার বললো- তাদের তো এমন সাহস হবার কথা নয়। তারা জানে এর ভয়াবহ পরিণতি। তারা ভুলেও এপথ মাড়াবে না তাতে আমি নিশ্চিত।
আচ্ছা আচ্ছা। তা না হয় বুঝলাম, তবে কি এমন প্রাণী এ বনে আছে যে আমাদের অবর্তমানে ঘরে ঢুকে আমাদের খানার পাত্রে হাত দিতে পারে?! পাপ্পা বিয়ারের কথা শেষ না হতেই বেবী বিয়ার চিৎকার করে উঠলো.... হায়! কে যেন আমার এমন মজার খানাগুলো খেয়ে ফেলেছে। আমি এখন কি খাবো? এবলেই সে কাঁদতে লাগলো।

মাম্মা বিয়ার বেবী বিয়ারের মাথায় হাত বুলিয়ে শান্তনা দিয়ে বললো- মামনি কাঁদে না। আমি তোমাকে আবার তার চেয়েও মজার পায়েশ বানিয়ে দেবো। তাতে আমার লাগবে মাত্র ১০ মিনিট। এবার মাম্মা বিয়ারও কিছুটা চিন্তিত হলো। তা হলে কে ঘটাতে পারে এমন কান্ড এমনি সাত-সকালে? বেবী বিয়ার আবারও কেঁদে উঠে বললো দেখো দেখো মাম্মি কে যেন আমার এতো সখের চেয়ারটি ভেঙ্গে দিয়েছে। এখন আমি কোথায় বসবো?
পাপ্পা বিয়ার বললো-যেহেতু এ বনের কোন প্রাণীর এখানে ঠোকার সম্ভবনা নেই। তবে নিশ্চয়ই দৈত্যদানব ঢুকেছে। চলো আমরা তিনজনে তিনদিকে আলাদাভাবে খুঁজে দেখি, সে এখনও কোথাও লুকিয়ে আছে কিনা।
এবার তারা তিনজনেই পুরো ঘরটির যতো ফাঁক-ফোকর দেখতে শুরু করলো, আর কোথাও তাদের কিছু মিসিং হয়েছে কিনা। তিনজনেরই প্রতিজ্ঞা, যাকে পাবে তাকেই আজ পিটিয়ে তক্তা বানিয়ে ছাড়বে। এরপর তারা তিনজনেই ঘরে যা ছিলো লাঠি-সোটা, দা কুড়াল নিয়ে খুঁজতে শুরু করলো সেই দেও-দানব।

পাপ্পা ও মাম্মাবিয়ার নিজেদের বিছানা এলেমেলো দেখে তাদের সন্দেহ আরো ঘনিভূত হলো যে, কেউ তাদের ঘরে ঢুকে এতোসব কান্ডকীর্তি ঘটিয়েছে এবং সে এখনও নিশ্চয়ইতাদের ঘরেই কোথাও লুকিয়ে আছে। তাকে আজ ধরে কঠোর সাজা দিতে হবে। ঠিক সেই মুহূর্তে উত্তরের কামরা হতে বেবী বিয়ারের আকাশ ভাঙ্গা চিৎকার ভেসে এলো। তারা দুজন দৌড়ে সেদিকে ছুটে এলো। এবারে বেবী বিয়ার কিছুই বলতে পারছে না। শুধু হাত দিয়ে ইশারায় দেখাচ্ছে।

এদিকে বেবী বিয়ারের চিৎকারে রিজার কাচা ঘুম ভেঙ্গে গেলো। সে ভল্লুকের গায়ের ভ্যাপসা গন্ধ পেলো। লাফ দিয়ে উঠেই দুহাতে দুচোখ কচরাতে কচলাতে সামনে দেখলো তিন তিনটে ভল্লুক দাঁড়িয়ে আছে। ভয়ে তার গা শিউরে উঠলো। সে চিৎকার দিয়ে বললো- ও গড এ দেখি বিয়ার। সেফ মি গড, প্লিজ সেফ মি। কে আছো বাঁচাও....বলে সে পেছনের খোলা জানালা দিয়ে দেয় এক লাফ। তাতে সে বাইরে গড়িয়ে পড়ে হাতপায়ে ব্যাথা পেল। কোনভাবে উঠে খুঁড়িয়ে পড়িমরি করে দিল এক দৌড়।

ছোট্ট মেয়ে রিজার দৌড়ের বহর দেখে পাপ্পা বিয়ারতো হেসে কুটিকুটি। মাম্মা বিয়ারও তাতে যোগ দিয়েছে। এবার বেবী বিয়ারের খুব রাগ ধরেছে।- কোথায় তোমরা ওকে ধরে সাজা দেবে, তা না করে তোমরা সেই দুষমনকে নিয়ে মজা করছে, আবার হাসছো।

পাপ্পা বিয়ার হেসে বললো- না মামনি সেও তোমার মতোই একটি অবুজ ছোট্ট ঘুমকাতুরে মেয়ে। থাক থাক তাকে যেতে দাও। এমনিতেই সে ভয় পেয়েছে। তার উপর আবার ওর পিছু ধাওয়া করলে সে ভীষন ভয়ে ঘুরে পড়ে মরেও যেতে পারে। তাতে আমাদের ভীষন অপরাধ হবে। তার জন্যে গড আমাদেরকে খুব কঠিন সাজা দেবেন। বেবী বিয়ার বললো- সে আমার বেডে শুনেছে। আমার নাস্তা সাবাড় করেছে। আমার চেয়ার ভেঙ্গেছে তারপরও....
-না লক্ষ্মীসোনা। সে তোমার মতোই অবুঝ শিশু। তার কি আপন-পর কোন কিছু জ্ঞান আছে? তোমার মতোই সে শুধু জানে খেতে এবং ঘুমাতে। তবে সে যদি আমাদের সাথে প্রথম পরিচিত হতো তাহলে আমরাই তাকে আদর করে ঘরে এনে আরো ভালোভালো খাবার দিতাম। সে জানে না যে, কারো ঘরে ঢুকতে হলে সে ঘরের মালিকের প্রথম অনুমতি নিতে হয়। নতুবা দোষ হয়। এই ধরো, যেটার মালিক তুমি নও মানে যা তোমার নয় অন্যের, সেটা তোমার যতই দরকার হোক না কেন সেই জিনিসের মালিকের অনুমতি ছাড়া তা তুমি ধরতে পার না। ধরলেই তোমার দোষ হবে, অপরাধ হবে। সেও বুঝেনা বলেই এমনি দোষ করেছে। আজ তাকে মাফ করে দাও। দেখবে তুমিও যদি কোথাও এমনি ভাবে বুঝের ভুলে অপরাধ করে ফেলো। সেখানে তুমিও মাফ পেয়ে যাবে। এটাই দুনিয়ার নিয়ম। মাম্মা বিয়ার অতীব মিষ্টি ভাষায় এমনি উপদেশগুলো শুনিয়ে তার আদরের সন্তান বেবী বিয়ারকে শান্তনা দেয়।

(বিদেশী শিশুতোষ কাহিনীর ছায়া অবলম্বনে)
রিয়াদ, সউদী আরব। ফেব্রুয়ারী ২০০২।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৪১তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে রূপসী চাঁদপুর এর বিশেষ সংখ্যা প্রকাশে খবর গ্রুপ এর মধ্যপ্রাচ্য প্রধান প্রতিনিধি (সউদী ব্যুরো চীফ) বিশিষ্ট লেখক ও সাংবাদিক মোঃ আবুল বশির আমাদের বিশেষ শুভেচ্ছা পাঠিয়েছেন। ওনার এ শুভেচ্ছার উত্তরে আমরাও ওনাকে আমাদের আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।-সম্পাদক

আমাদের সীমাহীন শুভেচ্ছা একুশে টিভিকে-

আমরা প্রবাসী লেখকরা এমনিতেই দেশের আলো-হাওয়া-প্রকৃতি প্রায় সব কিছু থেকেই বঞ্চিত। সেখানে একুশে টিভি দৃষ্টি এবং দেশজুড়ে অনুষ্ঠানদ্বয় প্রচারের মাধ্যমে আমাদের বুকের মাঝে প্রকৃত অর্থেই জিইয়ে রেখেছে সাহিত্যের সকল সজীবতা। তাইতো আমরা আজও লিখতে পারছি। বুকের গহীনে লালন করতে পারছি দেশপ্রেম। এর জন্য একুশে টিভি কর্তৃপক্ষকে আমাদের আন্তরিক সীমাহীন শুভেচ্ছা ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

- বাংলাদেশ রাইটার্স ফোরাম, মরুপলাশ সাহিত্য আসর এবং চাঁদপুর জেলা সাহিত্যও সাংস্কৃতিক ফোরাম।
রিয়াদ, সউদী আরব

শিশু সাহিত্যিক দেওয়ান আবদুল বাসেত সম্পাদিত

মরুপলাশ সাহিত্য আসরের বর্ষীয়ান প্রকাশনা

‘মরুপলাশ’

বাংলাদেশ রাইটার্স ফোরাম মুখপত্র

‘মোহনা’

মধ্যপ্রাচ্য প্রবাসী চাঁদপুর জেলাবাসীদের মুখপত্র

‘রূপসীচাঁদপুর’

আপনাকে লেখার জন্য উপরোল্লিখিত তিনটি
সাহিত্য পত্রেই সাদর আমন্ত্রন জানাচ্ছি ।
সরাসরি ফ্যাক্স যোগেও পাঠাতে পারেন।

Email : dewana@ngha.med.sa
marupalash@yahoo.com

মধ্যপ্রাচ্য প্রবাসী চাঁদপুর জেলাবাসীদের মুখপত্র

রূপসী চাঁদপুর

১৪১ তম রবীন্দ্র জন্মজয়ন্তীর বিশেষ সংখ্যায় যাঁরা লিখেছেন ঃ

প্রাবন্ধিক ডক্টর মনজুরুল ইসলাম, ডক্টর এ-কে আব্দুল মোমেন (যুক্তরাষ্ট্র)
কবি ও কথা শিল্পী ফিরোজ খান
কবি ও প্রাবন্ধিক হাবিবুর রহমান (জেদ্দা)
বিশিষ্ট রম্য রচয়িতা ও গল্পকার মেজবাহ্উদ্দিন জওহের, সবুজ সাগর
প্রখ্যাত আঁকিয়ে ও গল্পকার দেওয়ান মামুন
প্রখ্যাত অনুবাদ সাহিত্যিক ও কবি অধ্যাপক হেলালউদ্দীন আহমদ
কবি মনজুরুল আজিম পলাশ (লন্ডন)
গল্পকার ও কবি রিংকু সারথি
কবি কাঞ্চন মল্লিক, ইদ্রিস আলি মেহেদী
শিশু সাহিত্যিক দেওয়ান আবদুল বাসেত